দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ৩ জানুয়ারি, ২০২২।। ১৮ পৌষ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

মানুষের মেলা, মেলার মানুষ

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE™ NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৮ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৩ জানুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

ক্ষমতায় অন্ধ তৃণমূল ভুলে গিয়েছে বিজেপি থাকতে এসেছে, চলে যেতে নয় তাই... ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মা মাদার মমতা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কোভিডের আক্রমণে বহু শিশুর জীবন বিপর্যস্ত ◻ মহুয়া দাস ◻ ৮

টেরিজা ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের ‘গরিব-দরদি’ ভাবমূর্তি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

কলকাতা বইমেলা হোক বইপ্রেমীর জীবনযাপনের রসদ ◻ সুজিত রায় ◻ ১১

বাঙ্গলায় শিল্পায়ন ও বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ ◻ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৩

প্রাথমিক শিক্ষায় এগিয়ে বাংলা, পিছিয়ে শিক্ষকেরা ◻ জাহ্নবী রায় ◻ ১৮

মোক্ষ লাভে আর অধরা নয় পৌষ সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর মেলা ◻ স্বপন দাস ◻ ২৩

শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার বিবর্তন ◻ হীরক কর ◻ ২৬

নাথ দর্শন ও শৈব সাধন রীতি ◻ মহন্ত যোগী সুন্দরনাথ মহারাজ ◻ ৩১

ধন্বন্তরি অবতারে ভগবান বিষ্ণু চিকিৎসাশাস্ত্র প্রদান করেন ◻ কুশল বরণ চক্রবর্ত্তী ◻ ৩৪

নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে মাথা তুলে দাঁড়াল রমনা কালী মন্দির ◻ ঢাকার প্রতিনিধি ◻ ৩৫

যিশুখ্রিস্টের বাণী সনাতন ভাবধারা ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা থেকেই অনুপ্রাণিত ◻ দেবাশিস চৌধুরী ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮-৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ১০ জানুয়ারি ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১০ জানুয়ারি ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আন্তর্জাতিক যুবদিবস

স্বামীজীর জন্মদিনটি সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক যুবদিবস হিসেবে পালিত হয়। সংগত কারণেই এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠে আসে। বর্তমান প্রজন্ম স্বামীজীর আদর্শ সম্বন্ধে কতটা সচেতন? স্বস্তিকা'র আগামী সংখ্যায় এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা হবে। থাকবে স্বামী জ্ঞানলোকানন্দের সাক্ষাৎকার এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার **২৪ জানুয়ারি ২০২২** তারিখের সংখ্যাটি **স্বাধীনতার ৭৫ বছর অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে** বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটির **মূল্য ৫০.০০ টাকা**। এই তথ্যবহুল সংখ্যাটি অধিকাধিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাক এই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে বিশেষ আবেদন, সংখ্যাটির বহুল প্রচারের জন্য সহযোগিতা করুন। আপনার কত কপি প্রয়োজন আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জানান যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা ঠিকমতো আপনাকে পাঠাতে পারি।

যোগাযোগ—
শ্রীজয়রাম মণ্ডল, মো: ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
৮৬৯৭৭৩৫২১৪

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মনমিলান্তি

মেলার সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির সম্পর্কটি ছিল নিবিড়। সেইকালে প্রতিটি গ্রামেই কাকভুশণ্ডির মাঠের ন্যায় উন্মুক্ত প্রান্তর পাওয়া যাইত, যেইস্থানে সারা বৎসর নানা উপলক্ষ্যে মেলা বসিত। মাঠের নাম এইরূপ হইবার কারণ হইল মানুষের বসতি না থাকিবার নিমিত্ত এই স্থানে দিনের বেলাতেও কাক-পক্ষীর দর্শন মিলিত না। মেলা বসিবার উপলক্ষ্যের তালিকাটি সুদীর্ঘ। রথযাত্রার মেলা, শিবরাত্রির মেলা, ঝুলনের মেলা, রাসের মেলা, দোলযাত্রার মেলা — এমনকী কোথাও কোথাও মনসা, শনিঠাকুর, শীতলা, ওলাইচণ্ডী, দক্ষিণরায় এবং ঘেঁটুপূজা উপলক্ষ্যেও মেলা বসিত। তবে উপলক্ষ্য যত বিচিত্রই হউক, লক্ষ্য একটাই। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি। সেইসঙ্গে গ্রামের মানুষের জন্য কিঞ্চিদধিক মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা। গ্রামের কারুজীবী ও পেশাজীবীরা মেলায় বিপণী স্থাপন করিতেন। মানুষ গৃহস্থালীর নানা উপকরণ মেলার বিপণী হইতে ক্রয় করিত। নববিবাহিতা বালিকাবধূটি বয়স্থা ননদিনীর সহিত মেলায় যাইয়া পমেটম, কুন্তলীন কেশতৈল, চুল বাঁধিবার ফিতা, অক্ষয় সিন্দুরের বিপণীর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিত। তাহার পর ননদিনীর দৃষ্টি এড়াইয়া অঞ্চলপ্রান্ত হইতে বহুকষ্টে সঞ্চিত একটি সিকি বাহির করিয়া আকাঙ্ক্ষিত পণ্যটির দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া দোকানিকে বলিত, ওইটা।

ইহা অষ্টাশ শতকের শেষপাদের চিত্র। ইহার বিস্ময়কর সাহিত্যরূপ আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণের রচনায় পাইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী উপন্যাসে অন্ধ রাধারানির রথের মেলায় পুষ্পমাল্য বিক্রয় করিবার অনুপম বর্ণনা আজও বাঙ্গালি পাঠকের হৃদয়ে উজ্জ্বল। কিংবা, বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসে বাবার সহিত অপুর মেলা দেখিতে যাইবার কাহিনিও আমরা ভুলি নাই। যদিও অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর সেই মেলা আজ আর নাই। সময় যত অগ্রসর হইয়াছে, মানুষের রুচিও তত বদলাইয়াছে। মানুষের প্রয়োজন ও বিনোদন দুই-ই এখন নাগরিক। যুগধর্ম মানিয়া লইয়া গ্রামের মেলা সারল্য বিসর্জন দিয়া নাগরিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আর নাগরিক মেলা সর্বাঙ্গে অ্যামেরিকান কার্নিভালের ট্যাটু আঁকাইয়া বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়ছে। এখন কেহ যদি মেলায় গিয়া আখড়াই, হাফ আখড়াই, মোরগ লড়াই, কবির লড়াই বা বাঈনাচ খুঁজিতে চাহেন, তাহা হইলে নিশ্চিত বিমুখ হইবেন। ইহা বহুলাংশে স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু সম্পূর্ণত স্বাভাবিক বলিতে পারি না। যুগোপযোগী হইবার নিমিত্ত দেশীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা হইতে সরিয়া যাইতে হইবে কেন? কেনই-বা পরানুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মবিসর্জন দিতে হইবে? এখন বইমেলা শিল্পমেলায় উপস্থিত হইলে মনে হয় বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। বিদেশি প্রকাশনা সংস্থা বা বৃহৎ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ভারতের কোনও রাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য মেলায় অংশগ্রহণে আকৃষ্ট করিবার জন্য পরানুবৃত্তির প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। বিদেশি অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য ডাবের জল বা ঘোলের সরবত খাওয়ালেই চলে, মিনারেল ওয়াটার খাওয়াইবার আবশ্যকতা নাই।

বর্তমান পশ্চিবঙ্গ সরকার মেলা আয়োজনে বিশেষ উদ্যোগী ও পারদর্শী হইলেও, দেশীয় মেলাকে সম্পূর্ণ দেশজ শৈলীতে পরিবেশন করিবার ক্ষেত্রে পারঙ্গম নহেন। সাধারণ বাঙ্গালির ন্যায় তাহারাও পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করিবার মানসে স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়া ফেলেন। ইহা কাম্য নহে। পশ্চিমবঙ্গে আয়োজিত মেলা হউক বাঙ্গলার ও বাঙ্গালির। আধুনিকতা হইল সমন্বয়ের সাধনা। মননে আধুনিক না হইয়া কেবলমাত্র বহিরঙ্গে হইলে তাহা কালের নিয়মেই একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও একটি কথা না বলিলেই নহে। বাঙ্গলার মেলা তাহার চরিত্র হারাইয়াছে বটে কিন্তু একটি সুর অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সেটি মিলনের সুর। এখনোও মনমিলান্তির মঞ্চ হইয়া ওঠে বাঙ্গালার প্রতিটি মেলা প্রাঙ্গণ। অনেকদিন যোগাযোগ নাই এমন বন্ধুর সহিত হঠাৎ দেখা হইয়া যায়। বিবাহবিচ্ছিন্ন দম্পতি বইমেলার কোনও স্টলে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া বসে কীভাবে যেন তাহারা পুনরায় পরস্পরের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। মিলাইয়া দেওয়ায় মেলার স্বভাব। মিলাইয়া দেওয়ার পর জীবনের অনেক কটু সত্য কিয়ৎক্ষণের জন্য ভুলাইয়া দিতেও তাহার জুড়ি নাই। বাঙ্গলার মেলা অনেককিছু হারাইয়াও এইটুকু যে বজায় রাখিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সুভাষিতম্

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ।।

যিনি দুর্লভ বস্তু পাওয়ার ইচ্ছা রাখেন না, অনিত্য বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং বিপত্তির সময় নির্ভয়ে তার মুখোমুখি হন, তিনিই জ্ঞানী পুরুষ।

ক্ষমতায় অন্ধ তৃণমূল ভুলে গিয়েছে বিজেপি থাকতে এসেছে, চলে যেতে নয় তাই...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভোট লুট? না জনতার রায়? দ্বিতীয় কথাগুলি শুনে ঘোড়াতেও হাসবে। ৬০ শতাংশ বুথে ৭০-৯০ শতাংশ ভোটের হাস্যকর রেকর্ড গড়েছে তৃণমূল। আর তৃণমূল ভুলে গিয়েছে 'বিজেপি এ রাজ্যে থাকতে এসেছে, চলে যেতে নয়' (উক্তি : মমতার মুখ্য পরামর্শদাতা ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর)। বিজেপি নেতা তথাগত রায় যথার্থ বলেছিলেন 'সিপিএমের খুব ভালো ছাত্রী মমতা'। কলকাতা পুরভোটে তা প্রমাণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩২টি-তে এগিয়ে থেকেও ঘুম ছিল না মমতার। নিরঙ্কুশ হওয়ার স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। বিজেপির ১১৬ ওয়ার্ডে, সিপিএমের ১১২ ওয়ার্ডে আর কংগ্রেসের ৯৭ ওয়ার্ডে জমানাত জব্দ হয়ে যায়। আনুমানিক ৬০ শতাংশ বুথে ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ ভোট পড়ে। অথচ তথ্য বলছে মোট ভোট পড়েছে আনুমানিক ৬৪ শতাংশ আর ভোট দিয়েছেন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষ। বাকিটা তাহলে কে দিল? ঠিক যেমন টেট পরীক্ষায় আসন ছিল আনুমানিক ১৫ হাজার আর কাজ পেলেন ৩০ হাজার। হিসাব মেলাতে পারছে না তৃণমূল।

অদ্ভুত যুক্তি আমদানি করেছে তৃণমূল। অনেকটা 'বেশ করেছি' গোছের ভাব নিয়ে তাদের নেতারা বলছেন ত্রিপুরাতে বিজেপি একই কীর্তি করেছে। তাঁরা যে তেল আর জল মেশানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তা বলা বাহুল্য। তৃণমল প্রার্থীরা ৭টি ওয়ার্ডে ৯০ শতাংশের বেশি (১৩৪নং-৯৭.২৬ শতাংশ), ২৮টি ওয়ার্ডে ৮০ শতাংশের বেশি আর ৪৩টি ওয়ার্ডে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। ৬৬ ও ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৬২ হাজার এবং ৩৭ হাজার ভোটে জেতে তৃণমূল। মমতার বিরাট জয় দেখিয়ে সংবাদপত্রে এ তথ্য কবর দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন কোন চাতুরিতে মমতা তা সম্ভব করেছেন। সংবাদমাধ্যমে তা দেখাও গিয়েছে। ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে ৩৫ শতাংশ গ্রামবাঙ্গলার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেন মমতা। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে ৪২-এর মধ্যে ১৮ আসন পেয়ে উঠে আসে বিজেপি। ১২টি লোকসভা আসন হারায় মমতা। কলকাতা ভোটে পঞ্চায়েত ধাঁচের পুনরাবৃত্তি ঘটায় তৃণমূল।

বিধানসভা ভোটে হেরে গিয়ে সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল হয়ে যায় বঙ্গ-বিজেপি। এবার তার নড়াচড়া শুরু হয়েছে। মে মাসে ভোট হয় বিধানসভার। ডিসেম্বরে কলকাতার। এত অল্প সময় তৃণমূলের দাপট রুখে দেওয়ার শক্তি বঙ্গ-বিজেপির ছিল না। তাই খানিকটা 'ওয়াক-ওভার'-পেয়ে যায় তৃণমূল। আমার ধারণা বিজেপির জায়গায় তৃণমূল থাকলে একই দুর্দশা হতো। তৃণমূলকে ইচ্ছা করে জমি ছেড়েছে বিজেপি এটা আজগুবি গল্প। অনেকদিন থেকে বামেরা এই গল্প ছড়াচ্ছেন।

খাতায়-কলমে রাজ্যে বিজেপিকে ২ কোটি ২৮ লক্ষ ভোটার সমর্থন করেন। আর মমতার দলকে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ। তৃণমূলের ৪৭ শতাংশ ও বিজেপির ৩৮ শতাংশ ভোট। রাজ্যের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ৫০ শতাংশই বিজেপিকে সমর্থন করে। বিজেপি সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত অনবদ্য একটি লেখায় জানিয়েছিলেন ৮ শতাংশ ভোট কমে গিয়ে কীভাবে হেরে যায় বিজেপি।

তৃণমূলে শুরু হয়েছে শুদ্ধিকরণ বা ভুল শোধরানোর পালা। তা মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কি না বোঝা যাবে রাউন্ড ৩ আর রাউন্ড ৪-এ। বিজেপি কি খেলা ২-২ করতে পারবে? এখন সেটাই দেখার।

কংগ্রেসকে যে কোনো ভাবে ধ্বংস করে জাতীয় রাজনীতিতে জায়গা দখল করতে মরিয়া মমতা। পাশাপাশি 'বঙ্গ-বিজেপি'র নিধন তার উদ্দেশ্য। আমার ধারণা তা অধরা থেকে যাবে। মমতার পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোর আগেই জানিয়েছেন 'বিজেপি রাজ্যে থাকতে এসেছে চলে যেতে নয়'।

সিপিএম আর তৃণমূল উভয় 'অ্যাবসোল্যুটিস্ট দল'। বিজেপি-কেও এ দুর্নাম দেওয়া হয়। আমার মতে এটা আংশিক সত্য। সিপিএম-এ পার্টি বা দলই 'ঈশ্বর'। শেষ কথা। 'ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র মোড়কে উপরতলার নেতা নীচুতলার কণ্ঠরোধ করতে পারে। মমতার ওসব বালাই নেই। তিনি নিজেই দল, ঈশ্বর, সিদ্ধান্ত, আদর্শ, রাজনৈতিক কৌশল ও সব ধরনের 'গিন্নিপনা'-য় পারদর্শী। তাই আস্ফালন করে বলেন 'সব আসনে আমি প্রার্থী।' ক্ষমতা কায়েমের জন্য কোনও ভোটকেই খাটো দেখেন না মমতা। তাই কলকাতা ভোটে পুরোদস্তুর প্রচার করেন মমতা। ২৬ জনের 'তারকা' নেতার প্রচার তালিকা দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। দু'একজন ছাড়া কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তৃণমূলের আঁচ বাঁচাতে অনেকে কেবল বিজেপি গড় যেমন ২৩, ২৪ ওয়ার্ডে প্রচার সেরেই হাত ধুয়েছেন। শোনা যায় বিধানসভা ভোটে তাদের কেউ গণনা কেন্দ্র ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। রাউন্ড ১ আর ২ জিতেছেন মমতা। বাকি আছে রাউন্ড ৩ (১১১টি পৌরসভার ভোট) আর রাউন্ড ৪-লোকসভার ভোট। তাই কোমর বাঁধছে বিজেপি। বসে নেই মমতাও। তৃণমূলে শুরু হয়েছে শুদ্ধিকরণ বা ভুল শোধরানোর পালা। তা মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কি না বোঝা যাবে রাউন্ড ৩ আর রাউন্ড ৪-এ। বিজেপি কি খেলা ২-২ করতে পারবে? এখন সেটাই দেখার। □

মা মাদার মমতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

মাননীয় দিদি,

আজকের চিঠি কিন্তু এক মুখ্যমন্ত্রীকে। যিনি সদ্য একটা ভুল খবরকে সত্যি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। একা তিনি নন, তাঁর পারিষদরাও তাই করেছেন। দিদি, আপনাকে সত্যি প্রমাণ করতে ডেরেক দাদা যা করেছেন তাতে ওঁর প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা বেড়ে যাওয়া উচিত।

দিদি, আপনি রটিয়ে দিলেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নাকি মাদার টেরিজার সংস্থা মিশনারিজ অব চ্যারিটির সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। গোটা একটা দিন আপনি এই খবর চালিয়ে গেলেন। মিশনারিজ অব চ্যারিটি যত বলে যেতে লাগলেন, কেন্দ্র সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি টুইট করে যা যা লিখেছেন সেটার কোনওটাই সত্যি নয় বলে যে তাদের কোনও সমস্যাই হচ্ছে না, সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঠিক রয়েছে তত আপনি ও আপনার দলের পারিষদরা এক ভাবে বলে জানিয়েছে আপনার প্রিয় মাদার টেরিজার সংস্থা। আরও একটা কথা দিদি, আপনি টুইটে যা লিখেছিলেন তা কিছুক্ষণ আগেই লিখেছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। সেই টুইটের ভাষা তো বটেই লাইন ধরে দাঁড়ি, কমাও এক ছিল। কে কার দেখে মিথ্যা খবর ছড়িয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে দিদি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার দায় বেশি।

এটা গত ২৭ ডিসেম্বরের ঘটনা। আপনি মুখ্যমন্ত্রী এবং সূর্যকান্ত মিশ্র টুইটারে দাবি করেন, কেন্দ্র ২৫ ডিসেম্বর ‘মিশনারিজ অব চারিটি’র সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে সংস্থার কর্মীরা সমস্যায় রয়েছেন। সংস্থার পরিষেবার আওতায় থাকা হাজার হাজার রোগীরা খাবার এবং ওষুধ পাচ্ছেন না। এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে না-হতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়ে দেয়, কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই সরকারের তরফে বন্ধ করা হয়নি। বরং, ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কাছে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার আর্জি জানায়। তবে সাহায্য হিসেবে বিদেশি মুদ্রা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় অনুমোদন দেওয়া হয়নি ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’কে। সেটা কিছু শর্ত পূরণ না হওয়ার জন্যই বলে দাবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের।

> কেন্দ্রের প্রকল্প নিজের বলে চালানো থেকে রাজ্যের নানা প্রকল্প নিয়ে মিথ্যা খবর রটিয়ে বেড়ানো অনেক কিছুই তো করা হয়। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা খবর রটালে তার তো কোনও দায় থাকে না। সুতরাং চলতে থাকুক দিদি।

এর কিছুক্ষণ পরে মিশনারিজ অব চ্যারিটিও একই কথা বলে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়, কেন্দ্র মিশনারিজ অব চ্যারিটির কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেনি। বরং সংস্থার পক্ষ থেকেই সব শাখাকে বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত লেন-দেন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, বিদেশি মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত যে কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র প্রয়োজন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গত ২৫ ডিসেম্বর সেই ছাড়পত্রের পুনর্নবিকরণ স্থগিত রেখেছে সরকার। আর সে কারণেই আপাতত কোনও রকম বিদেশি মুদ্রার লেনদেন না করার সিদ্ধান্ত সংস্থার তরফে নেওয়া হয়েছে।

মাদার হাউজ কী করে, কেন করে, আদৌ সমাজের কোনও উপকার করে কী না তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের কাজকর্ম নিয়ে নৈতিকতার প্রশ্নও উঠেছে। ধর্মপ্রচারের জন্য দরিদ্র মানুষকে লোভ দেখানো থেকে অনেক অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু একটা ভুল খবর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আপনি জনমানসে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরির চেষ্টা করেন কী করে! এটা বিস্ময়ের। আপনি কি একটু ভুল হয়েছে বলে ক্ষমা চাইবেন নাকি বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে যাবেন! সেটাই বরং ভালো দিদি। বড়দিনের মরসুমে খ্রিস্টান ভোট টানতে একটু মিথ্যা বললে আর কী যায় আসে। কতই তো মিথ্যা বলতে হয় ভোট পাওয়ার জন্য! কেন্দ্রের প্রকল্প নিজের বলে চালানো থেকে রাজ্যের নানা প্রকল্প নিয়ে মিথ্যা খবর রটিয়ে বেড়ানো অনেক কিছুই তো করা হয়। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা খবর রটালে তার তো কোনও দায় থাকে না। সুতরাং চলতে থাকুক দিদি। চলতে থাকুক ডেরেক দাদার তোষামোদ। হোক না মিথ্যা, ক্ষতি কী! □

অতিথি কলম

মহুয়া দাস

কোভিডের আক্রমণে বহু শিশুর জীবন বিপর্যস্ত

যেখানে অভিভাবকদের যে কোনো একজন মারা গেছেন সেখানে পরিস্থিতির অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সামাল দেওয়া তুলনামূলকভাবে বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে।

গল্পের মতো শোনাবে যখন আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ১০ বছরের আস্থা এক অলীক নীরবতায় ডুবে যাবে, ১১ বছরের হর্ষ বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে দেবে, আর তিন বছরের অনুভব বোঝেই না যে তার বাবা-মা আর কোনোদিন তাকে কোলে নিয়ে ঘুরবে না।

এমনটাই ঘটেছে হাজার হাজার আচমকা অনাথ হয়ে যাওয়া ভারতের হতভাগ্য শিশুর ক্ষেত্রে। মুম্বাইয়ের সুখদেও আর উর্মিলা ওয়াধের ১০ বছরের ছটফটে মেয়ে আস্থা হোমওয়ার্ক বা অনলাইন লুডো বা কাগজে নীল আকাশের নীচে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ আঁকতে আঁকতে হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। যখন আমরা তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম, কথা না বললেও তার চোখদুটি বলে দিচ্ছিল— সে ভালো নেই। এমনটাই আস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বললেন ময়ূরী ভাবলে, আস্থার খুড়তুতো বোন। সাত দিনের ব্যবধানে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের করাল গ্রাসে চলে গেছেন আস্থার বাবা-মা। একইভাবে ১১ দিনের ব্যবধানে বাবা শঙ্কর সোমঙ্কর আর মা শশিকলা চলে যাওয়ার পর তাদের কাকিমা বীণা অকূল পাথারে পড়েছেন এদের মনের অতলান্ত গহ্বরের হদিশ পেতে। ১৯ বছরের ঋতুজাকে বাবা সম্পর্কে কোনো আলোচনায় ডাকলে সে উত্তর দিতে গিয়ে বিহ্বল হয়ে যায়। ক্ষণিকের মধ্যেই সে ভেঙে পড়ে। কিন্তু বিপরীতে তার ভাই হর্ষ মনের সব জানলা- দরজা বন্ধ করে দেয়। সে কাঁদে না, কথাও বলে না। ভীষণ মুশকিল হয় তার অতলান্ত নীরবতা ভাঙতে। আমাদের সমীক্ষায় অনেকের মধ্যে নিতান্ত কমবয়েসেই আস্থা আর হর্ষ দেশের নবীনতম অভিভাবক হারানো দুটি কিশোর কিশোরী। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করতে গিয়ে নিজেদের সেরা সম্পদ হারানোর ব্যথার সঙ্গে এখন নিরন্তর যুঝছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, অনেকে পারিবারিক আত্মীয়ের সঙ্গে থাকছে, আবার অনেকে কোনো এনজিও প্রতিষ্ঠানে ঠাঁই পেলেও তাদের জীবন চিরকালের জন্য বদলে গেছে।

জাতীয় শিশু অধিকার সংরক্ষণ কমিশনের দাখিল করা হলফনামা অনুযায়ী ভারতে ৭ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৯৮৮৫টি শিশু বাবা-মা উভয়কেই হারিয়েছে। ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১১৩ জন যে কোনো একজনকে হারিয়ে ফেলেছে। এক মর্মন্তুদ সত্য অনুযায়ী ১১ বছরের হর্ষ ১১ দিন আগে তার বাবার মৃত্যুর পর একটি বিশেষ বিদ্যালয় প্রোজেক্ট তৈরি করে তার মাকে জানাবে বলে ফোনের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল। হায়, সেই ফোনটি হসপিটালে ভর্তি তার মায়ের কাছ থেকে আর কোনদিনও আসেনি! তার কাকিমা জানাচ্ছেন আমার বুক ফেটে গেলেও আমি তাকে কথাটা বলতে পারিনি। আমি তাকে স্নান করানোর পর খাবার খাওয়াই এবং বলি যে, মা তার বাবার কাছে গেছে। হর্ষ কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে দিলেও কোনো সোচ্চার কান্না কাঁদেনি। মনে হয়েছিল সে এক মানসিক অবরুদ্ধতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

আস্থা ও হর্ষ ---এই শিশু দুটির পিতা-মাতার ৭ সপ্তাহের ব্যবধানে অকালমৃত্যু হওয়া তাদের যে প্রকাশহীন ভাবে কতটা বিধ্বস্ত করেছিল তা তাদের মৌনতা ছিল বিষাদময়। নিজে নিজেই হর্ষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে একজন বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য। আর আস্থা হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করে ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্য অটল করতে চাইছে। তারা উপলব্ধি করেছে এই দুটি প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারলে কোনো এক ঠিকানাহীন স্থানে থেকেও তাদের বাবা-মা নিজেদের সন্তানের জন্য গর্ববোধ করবেন। আর পাঁচটা পরিচিত নিষ্পাপ শিশুর মতোই হর্ষ জানাচ্ছে যে আর কোনোদিন তার বাবার সঙ্গে ফুটবল খেলতে পারবে না আর মাও কোনোদিন তাকে জড়িয়ে ধরবে না। কিন্তু আমি তাদের জগতের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলে অন্য কোনো কিছুতে মন দিতে পারব না। তার কণ্ঠস্বর ছিল আবেগহীন। এক অকাল প্রাজ্ঞতা তাদের অধিকার করে নিয়েছিল। আস্থা তার বাবার সঙ্গে ছোট্টো জীবনের পারিবারিক ভ্রমণগুলির সুখস্মৃতি রোমন্থন করে কোলহাপুর, শোলাপুর, তিরুপতি যাওয়ার কথা আর সেখানে চকোলেট ও আইসক্রিম খাওয়ার কথা বলতে বলতে ঝকঝকে হয়ে গেলেও ক্ষণিকের মধ্যে মেঘলা হয়ে বলল, 'আমি আমার বাবা-মায়ের কথা বলতে চাই না, আমি জানি না কেন।'

আমরা নমুনা হিসেবে এই দুটি কিশোর-কিশোরীকেই বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেছি। এরা এখন তাদের ২৬ বছরের খুড়তুতো বোনের ছত্রছায়ায় রয়েছে। বোন ময়ূরী বলছে এদের জীবনটাকে বাঁচার উপযুক্ত করে তুলতে আমি কোনো ফাঁক রাখব না। আমরা সপ্তাহে একদিন করে বাইরের পছন্দসই খাবার অর্ডার দিয়ে আনাই। কিন্তু এরা এত অনুভূতিপ্রবণ যে নিজেরা কখনও ইচ্ছে প্রকাশ করে না। তারা বেশ বুঝতে পারে এই দিদি আর কাকিমাই তাদের নতুন অভিভাবক আর সেটা সর্বদা মনে রেখে তারা তাদের সেরা ব্যবহারই উপহার দেয়। হর্ষ আর ঋতুর কাকিমার একটি আট বছরের ছেলে আছে। তিনি বললেন

আমার ছেলের সঙ্গে সমানভাবেই হর্ষকে বড়ো করে তুলব, যাতে তার আশা পূরণ হয়। আর অপর অভিভাবক খুড়তুতো দিদি মজা করে বললেন, আমার মনে হচ্ছে বাস্তবে মা, না হয়েও আমি নিজের অজান্তেই কেমন মা হয়ে উঠছি। এমন একটা অভিভাবকত্বের জীবন আমার কাছে একেবারে নতুন। আস্থার সঙ্গে তার গভীর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। হ্যাঁ, এখন আমিই তার মা তাই আমি মনস্থির করেছি এমন কাউকে আমি বিয়ে করব যে আমার সম্পর্কিত বোন কিন্তু কন্যাধিক আস্থাকে পূর্ণ মর্যাদায় মেনে নিতে পারবে।

কলকাতার অনুভব নামের নিতান্তই তিন বছরের দুধের শিশুটির কাছে বর্তমান অভিভাবকরা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারেনি তার পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া বাবা-মায়ের খবর। দাদুকে তার অবোধ প্রশ্ন : কোথায় মা, কোথায় বাবা? অনুভবের মা আগেই করোনা আক্রান্ত হওয়ায় সে মায়ের সঙ্গে অনেক সময়ই হাসপাতালে থেকেছে, তাই মায়ের হাসপাতালে আটকে থাকা সে মানতে পারছে না। তার কাকা বললেন, আমরা আশা করছি একটা সময়ের পর এই নিষ্পাপ শিশুটি তার জীবনের এই মা-বাবা উভয়কেই হারানোর অপূরণীয় ক্ষতির কথা আত্মস্থ করবে। আমরা অপেক্ষা করব। তাকে বড়োও করব। করোনার চরম নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়াগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকা কোমল স্নেহের বৃত্তিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করছে সন্দেহ নেই।

এই সূত্রে মনোবিদ ডাঃ হরিশ শেঠী বলেছেন এই অনাথ শিশুরা যত রকমের প্রশ্ন করবে তার জবাব দিতে হবে। তাদের এই শোকের পথ পরিক্রমায় বিশ্বের নানা সংবাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করাতে হবে। খবরগুলি তাদের কাছে গোপন করলে হবে না। অনেক সময়েই শোকগ্রস্ত শিশুটির নীরবে বসে থাকা বা অত্যন্ত অস্থিরতার সঙ্গে ছুটে বেড়ানোকে বিকার ভাবার দরকার নেই। এগুলি মহাশোকে আক্রান্ত শিশুগুলির নিজেদের অন্তর্লীন দুঃখের সঙ্গে লড়াই করারই এক দুঃসাহসিক বহিঃপ্রকাশ, বলেছেন ডাক্তারবাবু। অনাথ শিশুগুলির প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা যার বয়স যত কম তার চোখের জল তত কম। এর কারণ অনেক সময়ই তারা মনঃসংযোগ নিজেদের অজান্তেই অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। নিতান্ত শিশু হওয়ায় পৃথিবীর বহু জিনিসই তখনও তার কাছে একান্ত বিস্ময়ের।

সমীক্ষায় আর একটি বিষয় দেখা গেছে। যেখানে অভিভাবকদের যে কোনো একজন মারা গেছেন সেখানে পরিস্থিতির অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সামাল দেওয়া তুলনামূলকভাবে বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে। যেমন মহারাষ্ট্রের লাতুরের সন্তোষ কশাভে এপ্রিল মাসে কোভিডে মারা গেলে তাঁর ৩৮ বছরের স্ত্রী অনসূয়া তাদের নিতান্ত দুটি কিশোর সন্তানকে নিয়ে অথৈ জলে পড়েন। সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল স্বামীর মৃত্যুর পর অনসূয়া একটি দুগ্ধ উৎপাদক সংস্থায় ছোটোখাটো কাজ করছেন। তাঁর চিন্তা, ওই রোজগারে তিনি দশম শ্রেণীতে পড়া ডাক্তার হতে চাওয়া ছেলের প্রতিপালন কীভাবে করবেন! তাঁকে বাড়ি ভাড়া গুনতে হয়। ছোটো ছেলেটি ১৪ বছর, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর মৃত স্বামীর চিকিৎসার জন্য ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি ভাবতে পারছেন না কী করে ওই ঋণ শোধ করবেন। 'আমি সেই কারণে আমার ছেলেদের আমার কর্মস্থলে শিশুশ্রমিক হিসেবে কিছু ঠিকে কাজ করানো শুরু করেছি' জানালেন অনসূয়া।

ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখা বড়ো ছেলে আশুতোষ ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে তার আর স্কুলে ফিরে যাওয়া হবে না। তার বাবার স্বপ্ন ছেলের পৃথিবীর পথে এগিয়ে যাওয়া অপূর্ণই থাকবে। তার বাবা বিএড করার পর একটি স্কুলে কাজ করতেন। কিন্তু মহামারীতে স্কুল বন্ধ হওয়ার পর তিনি খেতমজুর হতে বাধ্য হন। যে কারণে তিনি আরও বেশি করে ভেবেছিলেন ছেলেরা এই দারিদ্রের শৃঙ্খল একদিন ছিন্ন করবে। তিনি সে জন্য কোনো ছোটোখাটো বাড়িও তৈরি করেননি, কেবল কিনে আনতেন নানা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সহায়ক বইপত্তর। ওলটপালট হয়ে গেছে জীবন, বাবা চলে যাওয়ায়।

তাঁর কাছ থেকে জানা গেল তারা কোনো সরকারি সাহায্যও পাবে না। বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে সে জেনেছে, যে ক্ষেত্রে মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছেন কেবল তারাই সাহায্য পাবে। এই খবর child right কর্মীদের গোচরে আনার পর তারা এটি নিয়ে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আশুতোষ তো একা নয়, কোভিডের আক্রমণ ভারতব্যাপী শিশু অসহায়তার শুধু অর্থনৈতিক নয়, এক অবর্ণনীয় মানসিক শূন্যতার জন্ম দিয়েছে।

(লেখক দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর)

শোকসংবাদ

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা মালদা নগরের বর্তমান প্রচার প্রমুখ কুমারেন্দ্র নারায়ণ ও স্বয়ংসেবক দীপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের পিতৃদেব দিলীপ কুমার মজুমদার গত ২৪ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি জেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সরস্বতী শিশু মন্দিরের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন—

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

টেরিজা ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের ‘গরিব-দরদি’ ভাবমূর্তি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন

গত বছরের শেষলগ্নে একটা খবরকে ঘিরে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। কারণ কী? কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নাকি ক্যাথলিক গির্জার সন্ন্যাসিনী টেরিজার প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অব চ্যারিটিজের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। মোদী-সরকারের সমালোচনার এহেন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি এ রাজ্যের বিরোধীরা। তৃণমূল সরকারের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র এই খবর রটা মাত্র আর কালবিলম্ব না করে টুইটারে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই অমানবিক কাজের ফলে মিশনারিজ অব চ্যারিটিজের আওতায় থাকা বাইশ হাজার রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা ব্যহত হবে। কংগ্রেস নেতা শশী থারুরও মমতার ট্যুইটটিকে রি-ট্যুইট করে কেন্দ্রের সমালোচনায় মুখর হন। যদিও বেলা গড়াতে জানা গেল, এই রটনা একেবারেই ভুয়ো। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কোনও অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (এফ সি আর এ) ও বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ বিধি (এফ সি আর আর) অনুযায়ী, তাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৩১ অক্টোবর শেষ হয়ে গেছিল। তার পরে এফসিআরএ-তে নথিভুক্ত করার মেয়াদ আর পাঁচটা সংগঠনের মতোই আরও দু’ মাস বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছিল। তা পুনর্নবীকরণের কোনো আবেদন গত বছরের ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা না পড়ায় মিশনারিজ অব্ চ্যারিটিজ নিজেরাই জটিলতা এড়ানোর জন্য অ্যাকউন্টগুলো বন্ধ করার আবেদন জানায় স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে। একথা ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়েও জানানো হয়েছে যে, তাদের অনুরোধেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ওই অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন সমস্যা হলো, এ রাজ্যের বিরোধী নেতা-নেত্রীরা যদি মনে করেন, কোনো একটি ছুঁতোনাতায় খবরের সত্যতা যাচাই না করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামবেন, সেটা ছেলেমানুষি ও লোকহাসানো হবে তো বটেই, সেইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামোর পক্ষেও শুভ ইঙ্গিত বহন করবে না। ভোট বড়ো বালাই, কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে আর কিছুদিন বাদে যেখানে গোয়ায় নির্বাচন, সুতরাং খ্রিস্টান ভোটব্যাঙ্কের লোভ আছেই, কিন্তু এই রুচিহীন রাজনীতি স্বাস্থ্যকর গণতন্ত্রের পক্ষে কাম্য নয়।

এই প্রসঙ্গে কিছু বলার আছে। টেরিজার ‘গরিব-দরদি’, ‘পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অশেষ উপকারী’, এরকম একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলবার চেষ্টা হলেও তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। এক ব্রিটেন-প্রবাসী বাঙ্গালি চিকিৎসক অরূপ চট্টোপাধ্যায় ২০০২ সালে ‘দ্য মাদার টেরিজা: ফাইনাল ভারডিক্ট’ নামে একটি বই লেখেন। তাতে তথাকথিত ‘মাদার’ ও মাদার হাউসের যাবতীয় কুকীর্তি জনসমক্ষে আসে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত, টেরিজা কিছু মানুষকে সেবা দিলেও তাঁর নোবেল পুরস্কারের ভাষণে দশ হাজার মানুষকে সেবা দিয়েছেন বলে মিথ্যাচার করেছেন। সবচেয়ে মারাত্মক তথ্যটি তুলে ধরেন তিনি, ১৯৯২ সালে টেরিজা এক ভাষণে স্বীকার করে নেন যে, তিনি ২৯ হাজার মানুষকে তাঁদের মৃত্যুশয্যায় তাঁদের অজান্তে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। অরূপবাবুর গবেষণা বলছে, প্রকৃত সংখ্যাটা এক লক্ষ পেরিয়ে যাবে। তিনি এও দেখিয়েছেন, নোবেল পুরস্কার জয়ের ফলে এবং ভারতের দারিদ্র্যকে ভাঙিয়ে টেরিজা কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সেই টাকা ভোগ বিলাসিতা এবং বিদেশে নিজের ব্যয়বহুল, দামি ও খরচসাধ্য চিকিৎসায় কাজে লগিয়েছেন। বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে তিনি টেরিজার আরও অনেক কুকীর্তি তুলে ধরে বইটি নতুন করে ছাপেন। ২০১৬ সালে তা বেরোয় ‘মাদার টেরিজা : আনটোল্ড স্টোরি’ নামে।

অরূপ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোক নন, বরং তিনি বাম-আমলের এক বিখ্যাত সিপিএম নেতার ছেলে। যে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হবে বলে পশ্চিমবঙ্গের নেতা-নেত্রীরা কেঁদে-কঁকিয়ে উঠেছিলেন, সেই টেরিজা সেবা-প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল ‘দ্য ল্যান্সেটে’র সম্পাদক রবীন ফক্স ওই প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসার মানকে ‘সাব স্ট্যান্ডার্ড’ (নিম্নস্তরীয়) বলে অভিহিত করেছেন। এমনকী নিরাময়যোগ্য রোগীও টেরিজার ‘চিকিৎসা’র দৌলতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলে তিনি পর্যবেক্ষণে জানান। মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, চিকিৎসা-বিদ্যার কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই এখানে রোগীদের ‘চিকিৎসা’ মেলে।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জার্মেইন গ্রিয়ার সঠিকভাবেই টেরিজার পরিচয়টা উদ্‌ঘাটন করেছেন, ‘ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদী’ হিসেবে। রাজ্যের তৎকালীন শাসক দলের দেশ-বিরোধী হিন্দু-বিরোধী মানসিকতাও অনুঘটক হিসেবে টেরিজার এই ‘মাতৃরূপী’ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য যথেষ্টই দায়ী। বিশেষ করে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা ভারতপ্রেমী ভগিনী নিবেদিতার বিপ্রতীপে দাঁড় করানোর গরজ ক্যাথলিক গির্জা ও সিপিএমের উভয়েরই ছিল। রোমান ক্যাথলিক গির্জা সংগঠনের ওই চার্চের ভিসার জেনারেল ফাদার ডমিনিকের একটি মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ নাকি ‘দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমদের বড়দিনের নিষ্ঠুর উপহার’। হতে পারে ভুয়ো কিংবা শোনা খবরের ভিত্তিতে এটা ডোমিনিকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু দিনের শেষে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, ভারতের দারিদ্র্যকে নিয়ে পশ্চিমি দুনিয়ায় ক্যাথলিক গির্জার ব্যবসা করাটাই মূল লক্ষ্য, কারণ তা পাশ্চাত্যে রীতিমতো বলা যেতে পারে, ‘সেলেবেল প্রোডাক্ট’। তাই সাম্প্রতিক এই ঘটনা টেরিজার ভাবমূর্তির পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাকেও ফের আরও একবার সামনে আনল। □

কলকাতা বইমেলা হোক বইপ্রেমীর জীবনযাপনের রসদ

সুজিত রায়

সব ইতিহাসেরই একটা ইতিহাস থাকে। কেউ তা মনে রাখে, কেউ মনে রাখে না।

কলকাতা বইমেলারও সেরকম একটা ইতিহাস আছে। দুঃখের কথা--- সেই ইতিহাসটা কেউ মনে রাখেনি। প্রবীণ প্রজন্ম কিংবা নবীন প্রজন্ম--- না, কেউই না। কলকাতা বইমেলা সম্বন্ধে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিটা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সাংস্কৃতিক শহরের মানুষের স্মৃতিতে ঘা দিতে যে বইমেলা নামক এক অনাবিল আনন্দের উৎসবটি কলকাতাবাসী চোখেই দেখতে পারত না, যদি না বিমল ধর এগিয়ে আসতেন।

কে এই বিমল ধর?

আজকের প্রজন্ম তাঁকে চিনবে না। প্রবীণ প্রজন্মের মানুষ হয়তো চেষ্টা করলে স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে পাবেন মানুষটিকে— লম্বা সুঠাম চেহারা। আপাদমস্তক সংস্কৃতিপ্রবণ বইপ্রেমী একজন মানুষ। কলকাতা বইপাড়ায় তাঁর একটি প্রকাশন সংস্থা ছিল— ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্স প্রকাশন। মূলত ইংরেজি বই ছাপতেন এবং সবই অত্যন্ত উচ্চমানের যার বড়ো অংশটাই চলে যেত বিদেশে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন নকশাল আন্দোলনে তোলপাড় বাঙ্গলার রাজনীতি। বাঙ্গলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছেন ইন্দিরা গান্ধীর স্নেহধন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৌত্র দেশের নামি ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশংকর রায়। যাঁর হাত ধরে নকশাল আন্দোলনের উন্মত্ততা পরবর্তী কয়েক বছরেই স্তিমিত হয়ে পড়বে এবং বাঙ্গলার রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বামশক্তি।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বইমেলা যখন রীতিমতো সুবিদিত এবং বহু দেশের কাছেই একটি ঈর্ষণীয় উৎসব, ঠিক তেমন সময়েই ১৯৭২ সালে নয়া দিল্লিতে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব বইমেলা। কলকাতা তখনও বইমেলার স্বপ্নও দেখেনি। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার দিগ্‌গজ প্রকাশন সংস্থাগুলি তখনও নিজ মদমত্তের ভারেই ন্যুব্জ। বইপাড়ার গতানুগতিকতার সেই অবহমানকালের ধারায় নতুন রক্ত সঞ্চালন করল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের একটা ছোট্ট উদ্যোগ। ১৯৭৪ সালে এনবিটি আকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ খুবই ছোটো মাপের কিন্তু পেশাদারি বইমেলার আয়োজন করল। সেটিও ছিল এক ধরনের জাতীয় বইমেলা যা এনবিটিই করেছিল মুম্বাইয়ের চার্চ গেট ময়দানে ১৯৬০ সালে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে। পরবর্তীকালে দিল্লি ও চেন্নাইতেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, বইমেলা সম্বন্ধে মানুষকে ও বই ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করে তোলা এবং বইয়ের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করা। একটি সরকারি সংস্থার এমন উদ্যোগ এ যুগে বিরল।

১৯৭৬ সালেই প্রথম শুরু হয় ক্যালকাটা বুক ফেয়ার বা কলিকাতা পুস্তকমেলা। বিড়লা তারামণ্ডলের উলটোদিকে মাঠে, যা এখন মোহরকুঞ্জ নামে পরিচিত, বসেছিল প্রথম কলিকাতা পুস্তকমেলা। ৫ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ।

কলকাতা বইমেলা কোনো সাধারণ মেলা নয়। কলকাতা বইমেলা সৃজনশীল মানুষের মেলা। সে মেলা যে কোনো ধরনের রাজনীতি থেকে যত দূরে থাকবে ততই মঙ্গল। তবেই কলকাতা বইমেলা ফিরে পাবে তার প্রাণ। তার উজ্জ্বলতা।

সেই বিরল উদ্যোগের সঙ্গী ছিলেন বিমল ধর। কারণ তিনিই এনবিটি-কে ডেকে এনেছিলেন কলকাতায় এবং আকাডেমিতে প্রথম তথাকথিত বইমেলা হতেই না সেই ১৯৭৪ সালে যদি না বিমল ধর উদ্যোগ নিতেন। পরবর্তীকালে যখন বইমেলা ফুলে ফেঁপে ওঠে, বিমল ধর তখন বইমেলা থেকে অনেক দূরে। সে কথায় পরে আসছি। তবে একটা কথা না বললেই নয়, এক সময় সাংবাদিক হিসেবে তাঁর মুখোমুখি হয়ে জানতে চেয়েছিলাম— বইমেলা আপনাকে আকর্ষণ করল কেন? শ্রীধর জবাব দিয়েছিলেন তাঁর স্বভাবসুলভ বিনীত কণ্ঠে— আসলে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় গিয়ে যেন আমি দিব্যচক্ষুর অধিকারী হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল— আজ না হোক কোনও একদিন কলকাতার মানুষের হাতে বইমেলাকে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়াটা দরকার।

১৯৭৪ সালের ছোট্ট প্রচেষ্টাটি অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। আর সেখান থেকেই শুরু হয় বার্ষিক বইমেলার চিন্তাভাবনা। এই চিন্তা নিয়ে বিমল ধরের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো গঠিত হলো পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। গিল্ডের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রকাশনীর সুপ্রিয় সরকার, অতি প্রাচীন দাশগুপ্ত অ্যান্ড

কোম্পানির প্রবীর দাশগুপ্ত, জিজ্ঞাসা প্রকাশনীর শ্রীশকুমার কুণ্ডা ও সুশীল মুখোপাধ্যায়, আর কিছু ছোটো বড়ো প্রকাশন সংস্থা এবং সাংবাদিক অতীন রায়। প্রাথমিক ভাবে সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছিল পাবলিশার্স গিল্ড। পরে সংবিধান তৈরি হওয়ার সময় নামবদল হয়। নতুন নামকরণ হয় বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ড। উদ্দেশ্য মূলত বার্ষিক বইমেলা করা আর পাবলিশার্স মহলের সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা করা। গিল্ডের উদ্যোক্তা বিমল ধর হলেও, প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন সুশীল মুখোপাধ্যায়।

পরের বছরেই ১৯৭৫ সালে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি ছোটো মেলা হয়। নাম দেওয়া হয়েছিল— ওয়ার্ল্ড অব পেপার ব্যাকস। ১৯৭৬ সালেই প্রথম শুরু হয় ক্যালকাটা বুক ফেয়ার বা কলিকাতা পুস্তকমেলা। বিড়লা তারামণ্ডলের উলটোদিকে মাঠে, যা এখন মোহরকুঞ্জ নামে পরিচিত, বসেছিল প্রথম কলিকাতা পুস্তকমেলা। ৫ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ।

আমি নিজে তখন কলেজের ছাত্র। মনে পড়ে, দুপুর হলেই মন ছুটত বইমেলায়। কলেজের ক্লাস তো রোজরোজ বাঙ্ক দেওয়া যায় না। তাই প্রথম সপ্তাহেই বার তিনেক ঢুঁ মেরে দিলাম প্রথম বইমেলায়। প্রথম বইমেলার সভাপতি ছিলেন শ্রীশকুমার কুণ্ডা। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো— কলেজ স্ট্রিট পাড়ার প্রকাশনী সংস্থার অনেকেই কিন্তু এড়িয়ে গেলেন বইমেলাকে। গিল্ডের প্রস্তাবে অনেকেই নাক কুঁচকে ছিলেন এই ভেবে যে, মেলায় মানুষ আসবে বই কিনতে এ ভাবনা অসম্ভব।

দূরদৃষ্টির অভাব যে ছিল তা আজ আরও স্পষ্ট যখন দেখা যায় শুধু কলকাতাতেই নয়, জেলায় জেলায়, পাড়ায় পাড়ায় আজ বইমেলা বাঙ্গলার হাজারো পার্বণের এক পার্বণ হয়ে উঠেছে। সেদিন যারা নাক কুঁচকেছিলেন তারা কিন্তু ওই ছোট্ট পরিসরের বইমেলায় মানুষের ভিড় দেখে চমকে গেলেন। পরের বছরে মেলার আকার বাড়ল এবং বাড়তেই থাকল প্রতি বছর দর্শক সমাগমের বাহুল্যে। কারণ বইমেলা প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠল বাঙ্গলার চোদ্দতম পার্বণ যে পার্বণ সবার— ৮ থেকে ৮০ সব বয়সের মানুষের।

কলকাতা বইমেলার ইতিহাসে ১৯৭৭ সাল একটি বিশেষ মাইল- ফলক। কারণ এই বছরই মেলায় প্রায় দু' লক্ষ বইপ্রেমীর সমাগম হয়, এবং বই বিক্রি হয় এক কোটি টাকারও বেশি। সেই যুগে সাধারণ বিনোদন মূলক কোনও মেলাতেই এত মানুষের ভিড় এবং এত টাকার লেনদেন ছিল অকল্পনীয়। অতএব জনপ্রিয়তা ছাপিয়ে গেল ১৯৭৮-এও। উদ্যোক্তারা এটা আশা করেই মেলার আয়োজন অনেকটাই বড়ো করে করেছিলেন। স্টলের সংখ্যা ছিল ১১২। তারপর থেকে প্রতি বছরেই সরকারি অনুমতি নিয়ে মেলার আয়তন বাড়তেই থেকেছে কারণ জনপ্রিয়তা ও বিক্রিবাটা। সমস্ত কল্পনাকে ছাপিয়ে যেত প্রতি বছরেই। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, ১৯৮৪ সালে বইমেলার তাঁবু ফেলতে হলো ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। অংশগ্রহণকারী প্রকাশকের সংখ্যা সেবার ৩৬৩। শুধু কলকাতার প্রকাশক নয়— এলেন দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাইয়ের প্রকাশকেরাও। ধীরে ধীরে মেলা ঠাঁই নেয় আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারে। গিল্ডের সদস্যপদ মেলে জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের। বছর বছর মেলা থিম গঠন করা শুরু হয় বিভিন্ন দেশকে ঘিরে। কখনও মেক্সিকো, কখনও বাংলাদেশ, কখনও-বা ফ্রান্স। আগমন শুরু হয় বিদেশি পাবলিশারদেও।

বইমেলার এই চমকপ্রদ সাফল্য সত্ত্বেও কয়েকটি প্রশ্ন মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। তা হলো কলকাতা বইমেলা গত ৪৬ বছরেও কেন পেল না একটি স্থায়ী ময়দান, যেখান থেকে আর কখনও উৎখাত হতে হবে না মেলাকে? কেনই-বা মেলা তার আদি প্রাণোচ্ছলতা হারিয়ে দিন দিন আনুষ্ঠানিক এক পরিকাঠামোয় পরিণত হচ্ছে? কেনই-বা দিন দিন কলকাতা বইমেলা কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে একটি রাজনৈতিক দলের প্রচার সর্বস্বতায়? কেনই-বা কলকাতার শিক্ষিত সমাজের একটা বড়ো অংশ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কলকাতা বইমেলা থেকে। কেনই-বা প্রতি বছর অসন্তোষ ঘিরে থাকে কলকাতার বইপাড়ার প্রকাশনী সংস্থার একটা বড়ো অংশের যাঁদের লটারির দোহাই দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় মেলার এক কোণে প্রায় চোখের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া ছোটো ছোটো স্টলে? বহুদিন আগে যখন বর্তমান গিল্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে বিমল ধরের, তখন তিনি আমায় বলেছিলেন— 'গিল্ড এখন পাবলিশার্সদের নয়। কিছু কৌশলী ব্যবসাদারের। তাই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি, সরিয়ে নিয়েছি বইমেলা থেকে।'

একসময় দেখেছি— এই মেলায় বসত গানের আসর। এখন সে আসর একটি রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত। আগে দেখেছি— মেলা জুড়ে হতো বইপ্রেমীদের মিছিল— মুখে থাকত স্লোগান, 'বই পড়ুন বই পড়ান।' এখন আর সে মিছিল দেখি না বহুদিন। ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বহু সামাজিক অনুষঙ্গের মতোই কলকাতা বইমেলাও অতি দ্রুত সংকীর্ণ রাজনীতির আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। হয়তো-বা কিছুটা বাধ্য হয়েই। কিন্তু এই প্রবণতা মারাত্মক। কলকাতা বইমেলা কোনো সাধারণ মেলা নয়। কলকাতা বইমেলা সৃজনশীল মানুষের মেলা। সে মেলা যে কোনো ধরনের রাজনীতি থেকে যত দূরে থাকবে ততই মঙ্গল। তবেই কলকাতা বইমেলা ফিরে পাবে তার প্রাণ। তার উজ্জ্বলতা।

আমরা যারা সারা বছর উৎসুক হয়ে থাকি বইমেলার জন্য তারা আশা করব--- ২০২১-এর বইমেলা থেকে শুরু হোক সেই হারিয়ে ফেলা পরিবেশ যেখানে বইমেলার উদ্বোধন হবে কোনো রাজনীতিবিদের হাতে নয়। বিশ্বখ্যাত কোনো লেখক, কবি বা প্রকাশকের হাত ধরে। সরকারি সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু যেন সরকারি নির্দেশের তল্পিবাহক হয়ে না ওঠে বইমেলার আয়োজক কর্তৃপক্ষ। আমরা চাইব, মেলা প্রাঙ্গণ স্থায়ী হোক। গড়ে উঠুক সঠিক পরিকাঠামো। সদিচ্ছার অভাবের শিকার না হোক বইমেলা। বইমেলা নিবেদিত হোক শুধু মানুষের জন্য— বই যাদের জীবনযাপনের রসদ। □

বাঙ্গলায় শিল্পায়ন ও বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ

বর্তমানে এ রাজ্যের নগরাঞ্চলের আলোকপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারিবারিক জনবিন্যাসের বদল পাড়ায় পাড়ায় জন কোলাহলহীন বৃদ্ধাবাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। নিকট ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী সাধ্যমতো অন্য অগ্রণী রাজ্যে বা দেশে ধাবিত হবে। এখানে থাকবে কেবল পালক ছাড়ানো বা লোম ওঠা গৃহপালিতরা। তারা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা ভাবতেই পারবে না। ছড়ানো তণ্ডুলের পিছনে আহ্লাদিত হয়ে ছুটবে। সেদিনের কথা ভাবলে মনে হতে বাধ্য, ভাগ্যিস তখন আমরা থাকবো না!

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

১৭৬০ থেকে ১৮৪০ এই সময়কালকে পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের সময় বলে ভাবা হয়ে থাকে। অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) আর মহা বিদ্রোহ (১৮৫৭)—এই একশো বছরের মধ্যেকার সময়টুকু। ভারতবর্ষে এই সময়কালে পশ্চিমে মুম্বাই-সুরাটে উপকূলে ও পূর্বে কলকাতায় আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টা যেটুকু হয়েছিল তার কুশীলবরা ছিলেন কিছু পার্শি, ইহুদি, সিন্ধী পরিবার এবং এক ও অদ্বিতীয় বাঙ্গালি দ্বারকানাথ ঠাকুর, যিনি পরে প্রিন্স নামে খ্যাত হন।

পরের একশো বছরে অর্থাৎ ১৮৫৭ থেকে ১৯৫৭ এই সময়কালে রেলপথ ও টেলিগ্রাফের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ছিল অভাবনীয়। বিশেষ করে ব্যক্তি পুঁজির বিকাশ। উনবিংশ শতকের শেষভাগে মেইজি শাসনকালের জাপানের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও অনেক বিশেষজ্ঞের মতে সেই সময়ের ভারতের অবস্থা প্রাকবিপ্লবের রাশিয়ার চেয়ে ইতরবিশেষ ছিল না।

পশ্চিম উপকূলে জাহাজ নির্মাণে, ওয়াড়িয়া সূতিবস্ত্রে এবং অনেক ব্যবসায় টাটাদের উপস্থিতি ছিল নজর কাড়া। বর্তমান প্রয়াসে আমি কেবল বাঙ্গালি উদ্যোগপতিদের ভূমিকা এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক বাস্তব ও ভবিষ্যতের পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য রূপরেখার প্রতি আলোকপাত করব।

সন ১৮৩৬। প্রিন্স দ্বারকানাথ ইংরেজ এজেন্সি হাউস আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানির কাছ থেকে রানিগঞ্জ কোলিয়ারি কিনলেন। শুরু করলেন গুনটানা নৌকোয় কলকাতা থেকে গঙ্গার মোহানা পর্যন্ত পণ্য পরিবহণ। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ স্টিমার সার্ভিস, এমনকী আকরিক কয়লা পরিবহণের জন্য বার্জ ব্যবহার। রানিগঞ্জ থেকে ১৬০ কিলোমিটার রেলপথ বসানোর জন্য তিনি রানির অনুমতি চাইলেন। কিন্তু একজন নেটিভ ভারতীয়ের এই যাত্রার প্রয়াসকে লাইনচ্যুত করল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। রানিগঞ্জে প্রিন্সের বানানো জীর্ণ অট্টালিকাটি আজও আছে। (বছর দশেক আগে সেটি দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। 'Spider hangs her tepestry in the palaces of the Caesars' এই ইংরেজি প্রবচনটিকে মান্যতা দিয়ে সেখানে তখন বসবাস করছিল একটি বাঙ্গালি পরিবার। প্রিন্স অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আমদানির কথাও ভেবেছিলেন। পৌরুষের সাফল্যে দূরদৃষ্টির স্বপ্ন জ্বালানি সরবরাহ করে। ১৮৫৪-তে কলকাতা থেকে রানিগঞ্জে রেলপথ পত্তনের তখনো ১৮ বছর বাকি।

বঙ্গভঙ্গ, স্বাদেশিকতা ও বাঙ্গালির শিল্পোদ্যোগ

বঙ্গভঙ্গের প্রায় সত্তর বছর আগে দ্বারকানাথ এই বাঙ্গলায় বহুমুখী শিল্পোদ্যোগের যে রাজপথ নিজে হাতে গড়ে গিয়েছিলেন সেই পথে হেঁটে পুত্র দেবেন্দ্রনাথ যুগপৎ ব্রহ্মচিন্তক মহর্ষি ও প্রজানিপীড়ক পরিচিতি পেয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির প্রতিভার পরম্পরা ভিন্ন পথে গেলেও ১৯০৪-এর রিজলি

পরিকল্পনা এবং ১৯০৫-এ কার্জনের আনা বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বোমার মতো ফেটে পড়েছিলেন প্রকাশ্যে রাজপথে।

বাঙ্গলা, বিহার, ওড়িশা, অসম নিয়ে যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, সেই বঙ্গকে বিভক্ত করা থেকে কার্জন পিছু হঠলেও বাঙ্গলার ভাগ্য তার ফলে ফিরলো না। ছ' বছর পরেই বাংলাভাষী অখণ্ড বঙ্গ থেকে ওড়িশা, বিহার ও আংশিক অসম পৃথক হলো। সেই সঙ্গে দেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লিতে।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলে ১৯৪৭-এর বঙ্গভঙ্গ হতো না। কিছু হিন্দু জমিদারের বাধা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালি আবেগকে ব্যবহার করে নাখোদা মসজিদের প্রধানকে রাখি পরাতে পারলেও এই সাফল্য শাসকের হাতে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বদলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অস্ত্রটি তুলে দিয়েছিল। বর্তমান ভারতে হিন্দি বা তেলুগুভাষী একাধিক রাজ্যের মতো সেদিন বড়োজোড় বাংলাভাষী দুটি রাজ্য হতো। এর ফলে ১৯৩৫-এর প্রশাসনিক ভারত শাসনের আইনে জনসংখ্যার প্রশ্নে ধর্মের বিষয়টা বাড়তি গুরুত্ব পেল। তারিক আলির ভাষায় এটা ছিল পাখির মুখে গাজর ধরার মতো। খেলে ও হজম করলে নতুন গাজর দেওয়া হবে। সুভাষচন্দ্র বসু থেকে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এই আইন ভারতের জাতীয়তাবাদের পরীক্ষা। কবি ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে তীব্র সমালোচনা করলেও গান্ধীজী এই আইনের পক্ষে ছিলেন। গান্ধীজীর অনেক ভুল সিদ্ধান্তের মতো এটাও হয়েছিল ইংরেজকে শক্তি জোগানোর হাতিয়ার।

বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক প্রভাব ছেড়ে আমরা যদি একটু অন্য দিকে দৃষ্টি দিই তা হলে দেখব ১৯০৫-এর ঘটনাবলী হিন্দু বাঙ্গালি জনমানসে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছিল। এক কথায় যাকে বলা হয় স্বদেশ চেতনা বা স্বাদেশিকতা। বহু উচ্চশিক্ষিত তরুণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনের মধ্য দিয়ে শিল্পোদ্যোগের প্রয়াস ছিল এই স্বাদেশিকতার অন্যতম বড়ো প্রাপ্তি। শিল্পস্থাপনে শামিল হওয়া এই প্রতিভাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পূর্ববঙ্গের ধনী জমিদার সন্তান। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের আর এক শ্রেণীর ধনী জমিদারপুত্ররা পিতৃ-অর্থে বিলেতে শিক্ষিত হয়ে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বা ব্যবসায় আগ্রহী না হয়ে আইন, সাহিত্যচর্চা, অধ্যাপনা এবং সর্বোপরি রাজনীতিতে আগ্রহী হলেন। আলোচনার পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব এই শেষোক্ত জনেদের কমিউনিজমে আস্থা এবং প্রবলভাবে পুঁজিবাদ বিরোধিতা প্রথমোক্ত উদ্যোগপতিদের মূলধন গঠন ও শিল্পায়নের প্রয়াসে কেমনভাবে জল ঢেলে দিয়েছে। একই থলিতে মাছ আর ফুল একসঙ্গে রাখলে মাছে ফুলের গন্ধ হয় না, বরং ফুলেই আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে যায়।

এমনই আর এক বিখ্যাত বাঙ্গালি প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানি। এদের প্রখ্যাত উৎপাদিত সামগ্রী ডাকব্যাক এক সময় বিলেতি পণ্যের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিল। একদা যুদ্ধবন্দি ও পূর্ববঙ্গের সন্তান সুরেন্দ্রমোহন বোস বিদেশ থেকে অর্জিত বিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে রাবার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখে গিয়েছেন এই ডাকব্যাকের মধ্যে। ব্যাঙ্কিং শিল্পের ক্ষেত্রেও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, পিয়ারলেসের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বাঙ্গালি উদ্যোগের অন্যতম দাবিদার।

শিল্প ছেড়ে যদি উচ্চশিক্ষা গবেষণার কথা ভাবা যায় প্রথমেই আসবে বোস ইনস্টিটিউট তথা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কথা। যাকে বিশ্ব মানচিত্রে অন্যতম সেরার মুকুট পরিয়ে গেছেন আলডুস হাক্সলি। কালটিভেশন অফ সায়েন্স, সাহা ইন্সটিটিউট, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কৃতী বাঙ্গালির এক একটি অক্ষয় কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে।

পূর্ববঙ্গের এইসব হিন্দু উদ্যোগীদের হাতে গড়ে ওঠা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এক সময় সারা ভারতে সমীহ আদায় করা নাম ছিল। অতীতে যশোর জেলার ভেবে গ্রাম থেকে উঠে আসা চার বছর বয়সে পিতৃহারা রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির স্যার রাজেনে উত্তরণ রূপকথাকেও হার মানায়। ১৯৬০ সালেও মুখার্জি পরিবার ছিল দেশে তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প পরিবার। সেই সময় প্রায় সব শ্রমিক সমাবেশের ভাষণেই জ্যোতি বসু 'শ্রেণীশত্রু' পুঁজিপতিদের নাম করলেই টাটা-বিড়লার পর স্যার বীরেনের নাম করতেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বেলুড় মঠ, টালার জল প্রকল্পের মতো একাধিক সাফল্যের সঙ্গে স্যার রাজেনের সুযোগ্য পুত্র মাত্র পনেরো বছরে বার্নপুরের ইস্কোকে দেশের শিল্প মানচিত্রে অক্ষয় আসনে বসালেও শেষ জীবনে বাঙ্গালিরই অসহযোগিতায় চূড়ান্ত হতাশার শিকার হয়েছিলেন।

ঢাকার নরশিংদা জমিদার পরিবারের সন্তান তিনভাই— সুরেন, হেমেন, কিরণ রায় গড়ে তুলেছিলেন বেঙ্গল ল্যাম্প। সুরেন, হেমেন জার্মানি থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন। ১৯৭০ সালে বেঙ্গল ল্যাম্প বেঙ্গালুরুতে শাখা বিস্তার করে ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের অধিকারী হয়। তৈরি করে কিরণ ল্যাম্পও। পরবর্তীকালে দেশে অন্যতম প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান দুর্ভাগ্যজনক এক রাজনৈতিক কেলেঙ্কারির শিকার হয়ে পড়ে।

১৯০৫-এ এফএন গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ঝরনা ফাউন্টেন পেন, ১৯৩৪ সালে রাজশাহির ননীগোপাল ও শঙ্করাচার্য মৈত্রেয় প্রতিষ্ঠিত সুলেখা, বন্দেমাতরম ম্যাচ ফ্যাক্ট্রি, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সব বঙ্গভঙ্গজাত স্বদেশি আন্দোলনের ফসল।

১৯১৬-তে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নেওয়া কে সি দাস, বি এন মৈত্র এবং এন সেন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা কেমিক্যাল একই গৌরবের সাক্ষী। মার্গো সাবান ও নিম টুথপেস্টের ক্যালকাটা কেমিক্যাল পরবর্তীতে শ'ওয়ালেস ও জার্মান সংস্থা হেঙ্কেল অধিগ্রহণ করে। সাংসদ সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্তর পরিবার এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

কেবল ক্যালকাটা কেমিক্যালই নয়, ভারতে প্রথম আধুনিক রসায়ন গবেষণাগার ও বিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা যশোর থেকে আসা বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অমর হয়ে আছেন। কুমিল্লার প্রতিভা এবং সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়া ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত গড়ে তুলেছিলেন বেঙ্গল ইমিউনিটি। একদিন দেশ বিদেশে জীবনদায়ী ওষুধ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানটি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এছাড়া দেজ মেডিক্যাল, জি ডি ফার্মাসিউটিক্যাল, ইস্ট ইন্ডিয়া

ফার্মাসিউটিক্যালস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান একদা সর্বভারতীয়ই কেবল নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। এই প্রসঙ্গে কুষ্টিয়ার মোহিনী মোহন চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত পূর্ববঙ্গের একদা বৃহত্তম সুতিবস্ত্র প্রতিষ্ঠানটিও উল্লেখযোগ্য। শিল্প প্রতিষ্ঠানটির দুটি শাখা পরবর্তীতে বেলঘড়িয়া ও শ্যামনগরে সম্প্রসারিত হয়। সবগুলোই আজ মৃত।

বঙ্গীয় শিল্পের মৃত্যু বিনোদন

'আয় রে আয় নগরবাসী দেখবি যদি আয়
জগৎ জিনিয়া চূড়া যম জিনিতে যায়'—কলকাতার বাবু চূড়ামণি দত্ত অন্তর্জলি যাত্রায় বের হয়েছেন। মৃত্যুশয্যায় থেকেও আয়োজক তিনি। তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী সদ্যঃপ্রয়াত রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির সামনে আসতেই ঢাকে আরও জোরে বোল উঠল, 'চূড়া যম জিনিতে যায়'।

দেশভাগের পর থেকে একইসঙ্গে পাটের মতো শিল্পে কাঁচামালের উৎস ও বিক্রির বাজার হিসেবে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনায় বড়ো প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দেখা দেয়। তবুও মানচিত্রগতভাবে প্রতিবন্ধী কলকাতা-সর্বস্ব পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে বজবজ থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত শিল্পাঞ্চল রাজনীতিজীবী নেতাদের আন্দোলনের জন্য শ্রমিক সরবরাহের নিশ্চিত উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, ভূপেশ গুপ্তর মতো ঝকঝকে কমিউনিস্ট নেতা সকলেই ছিলেন মেড ইন ইংল্যান্ড। সেই সঙ্গে ব্যক্তিপুঁজি ও পুঁজিবাদের চরম বিরোধী। একই সঙ্গে মহলানবিশের পরিকল্পনাজাত স্টেট ক্যাপিটালিজমের স্বপ্ন সাধক। স্বাধীনতার দু'দশক পর ভারতের অন্যান্য রাজ্যে একটা ধারণা দানা বাঁধে। সেটা হলো, বাঙ্গালি মেধাগত সৃষ্টিশীলতায় অদ্বিতীয় হলেও এককভাবে ব্যবসা পরিচালনায় মোটেই দক্ষ নয়। ভদ্রলোক বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থরা কন্টকিত ঝুঁকিবহুল উদ্যোগের পথ অপেক্ষা চলচ্চিত্র নির্মাণ, ললিতকলা, কাব্য, সংগীতে বেশি স্বচ্ছন্দ। লায়ন্স রেঞ্জ বা বড়বাজারের চেয়ে কলেজ স্ট্রিট, নন্দনই তাদের বেশি পছন্দের। আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে অর্থনীতি চর্চায় বাঙ্গালির সংখ্যা বলার মতো। অর্থনীতির দুটো নোবেলই (নাগরিক যে দেশেরই হোক না কেন) বাঙ্গালি পকেটস্থ করেছে।

এটা ঠিক, অর্থবলে মাড়োয়ারি, সিন্ধি, গুজরাটিরা অনেকটাই বেশি শক্তিশালী হওয়ায় ভারতত্যাগী ইউরোপিয়ান শিল্প সংস্থাগুলো অধিগ্রহণে তারা এগিয়ে আসে। পাট, চা, ব্রিউয়ারি, সিগারেট ছাড়াও চামড়া, কাগজ, পেইন্ট, অ্যালুমিনিয়াম বা ব্রেথওয়েট, জেশপ, টেক্সম্যাকো, গেস্ট কিন উইলিয়ামের মতো অসংখ্য ছোটো বড়ো মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে বিনিয়োগে তারা এগিয়ে আসে।

আধুনিক অর্থনীতির জনক আদম স্মিথ তাঁর মূল্য তত্ত্বে মুক্ত বাজারে চাহিদা জোগানের স্বাধীন আচরণ ও মুনাফা মজুরির মধ্যে ব্যাস্তানুপাতিক সম্বন্ধের কথা বলেছিলেন। কার্ল মার্কস স্মিথের দ্বিতীয় বিষয়টির ভূয়সী প্রসংসা করলেও প্রথম বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি। যদিও তিনি ১৮৮৬-তে শিকাগোর হে মার্কেটে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে মে দিবসের ঘটনার চার বছর আগে প্রয়াত হন, তবুও লেবারের থেকে লেবার পাওয়ারকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর কালজয়ী শ্রমের প্রান্তিক শোষণ তত্ত্ব হাজির করেন।

মার্কসের অর্থনৈতিক ভাবনায় বৈষয়িক কাজকর্মে সরকারের নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শ্রমকে উৎপাদনের একমাত্র উপাদান হিসেবে বলা হয়েছে। পরিবেশের মতো উৎপাদনের উপকরণটি, যেটা সনাতন ধর্মে অনেকাংশে এবং বৌদ্ধ ভাবনার প্রায় সবটা জুড়ে আছে সেই বিষয়গুলো মার্কসের মতো বিরল প্রতিভার ভাবনাতে না আসাটা বিস্ময়ের তো বটেই, এমনকী ইউরোপে থেকে শিল্প বিপ্লবকে সামনে থেকে চাক্ষুষ করে প্রযুক্তিকে গুরুত্ব না দেওয়াটাও অবাক হওয়ার মতো। আধুনিক পৃথিবীতে ১৯৬২-তে রেচেল কার্সনের সাইলেন্ট স্প্রিং প্রকাশ হওয়ার পর জ্ঞানপাপী মানুষ পরিবেশ সচেতন হয়েছে।

কিন্তু আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বঙ্গীয় মার্কসবাদীদের 'মার্কসবাদ অবিনশ্বর কারণ ইহা সত্য' স্লোগানকে সামনে রেখে অন্ধ পুঁজি বিরোধিতার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। একজন ক্রেতা ও বহু বিক্রেতার শ্রমের বাজারে ট্রেড ইউনিয়ন করাটাও একটা ইলিউসন হয়ে ওঠে যদি এক প্রতিষ্ঠানে একাধিক শ্রমিক সঙ্ঘ থাকে। এই বাস্তবতা থেকেই মে দিবসের দিন কেউ ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে কেউ বা ময়দানে সমবেত হয়ে দুনিয়ার মজদুরকে এক হতে বলে।

যখন একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত সরকারি কর্মচারীও কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনতে পারে, ভূমিহীন বা প্রান্তিক কৃষক সামাজিক নিরাপত্তা পায়, তখন 'সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই' এই স্লোগান অনেকটাই কমজোরি হয়ে পড়ে।

এইসব বাস্তবতাকে সরিয়ে রেখে ১৯৬৭-তে এই রাজ্যে মার্কসবাদীরা সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলল, শ্রমিকরা মালিক বা উচ্চ পদাধিকারীদের ঘেরাও করলে পুলিশ যাবে না। উচ্চ ন্যায়ালয় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলে সরকার পরে legitimate এবং unlawful action কথাগুলো যোগ করে। এর ফলে শ্রমিকদের জঙ্গি আন্দোলনে বাধা থাকে না। পরোক্ষ সরকারি সমর্থন পায়। ১৯৭৪-এ অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে 'ঘেরাও' শব্দটা যুক্ত হয়।

মার্কসের কেবল লেবার থিয়োরি অব ভ্যালু-ই নয়, কম্পিউটারের মতো আধুনিক প্রযুক্তির থেকেও মুখ ফিরিয়ে এবং সেই সঙ্গে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজেদের মার্কসীয় আনুগত্য দৃঢ় করে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল।

আমরা বলি লক্ষ্মী চঞ্চলা, কিন্তু বাস্তবে সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। financial capital-কে open track-এ রিলে রেসে ছুটতে না দিলে ফিক্সড ডিপোজিটের ক্রমহ্রাসমান সুদের মতো লক্ষ্মী (পড়ুন পুঁজি) কমতেই থাকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিযাত্রিক গ্রন্থে যে বাঙ্গালিকে অলস, কুঁড়ে ও সর্বজ্ঞ বলেছেন, সেই বাঙ্গালি সেটাই পছন্দ করে। আজকের বাঙ্গালি ধনীরা মূলত রেন্টার, ইনভেস্টার নয়। সব জমানাতেই এখানকার শাসক দলগুলো যে কোনওরকম বাজারমুখী সংস্কারের বিরোধী। অর্থাভাবে প্রায় কোমায় চলে যাওয়া বিশাল এলাকা জোড়া এবং একদা ফিউডাল পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা হাসপাতাল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্তর্জলিযাত্রার নীরব দর্শক। Privatization of public utility-র বিরুদ্ধে সোচ্চার। যদিও নেতারা বাধ্য না হলে কখনোই সরকারি হাসপাতালে নিজেদের চিকিৎসার জন্য যান না।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি, ২০১২, কোনও এক সংস্থার এক্সিকিউকুটিভ ভাইস প্রেসিডন্টে ফ্যাক্টরি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর গাড়িতে বোমার আঘাতে চালক গুরুতর জখম হলেন। কারখানা কয়েক মাস বন্ধ থাকল। সেই সংস্থা অর্থাৎ জয় ইঞ্জিনিয়ারিঙের নীলকণ্ঠ রত্নাকর ডোঙ্গরা বাড়ি ফিরে সব জরুরি কাগজপত্র নিয়ে টানা গাড়ি চালিয়ে দিল্লি চলে গেলেন। তাঁর আনুগত্যে খুশি হয়ে মালিক চরতরাম ডোঙ্গরাকে পার্টনার বানিয়েছিলেন।

শিল্পপতি সিঙ্ঘনিয়ার আসানসোলের কাছে অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া দেশের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী সংস্থা ভাবা হয়। দু'ঘণ্টা ধরে ওয়ার্কস ম্যানেজারকে শ্রমিকরা পেটানোর পর সিঙ্ঘানিয়া মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির কাছে যান। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি বললেন শ্রমিকদেরই মারা হয়েছিল। সিঙ্ঘানিয়া পুত্র হরিশঙ্করকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করলেন।

১৯৭০ সালে আর এন মুখার্জি রোডের উপর ১৭ তলা বিল্ডিং বানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিড়লাদের সব অফিস টাটা সেন্টারের মতো সেখান থেকে পরিচালিত হবে। তার আগে ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস থেকে সেগুলো পরিচালিত হতো। শ্রমিকরা প্রথম দু'সপ্তাহ কোনো কাগজ নিয়ে যেতে দেয়নি। ১৯৭২-এ রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হলে পুলিশের সাহায্যে গৃহপ্রবেশ করা যায়। ততদিন শহরে ৩২ টা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বিড়লারা কাজ চালায়। আজও ভবনের মূল ফটকের ফলকে লেখা আছে 'occupied since 1972'.

বিদ্যুৎ সংকট জনিত সমস্যায় প্রায় দেউলিয়া হওয়া থেকে সাহায্য চাইতে গেলে আর এক শিল্পপতিকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু স্পষ্ট বলেছিলেন, পুঁজিপতিরা শ্রেণীশত্রু। তাদের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি নেই। কে জানে এই জন্যই এস কে বিড়লার পুত্র সিদ্ধার্থ কলকাতা থেকে তাঁর দপ্তর দিল্লি স্থানান্তরিত করেছিলেন কি না। একটা পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৬৫-তে যেখানে লক আউটের সংখ্যা ছিল পশ্চিমবঙ্গে ৪৯ এবং স্ট্রাইক ১৭৯, ১৯৭০-এ সেই সংখ্যাটা হয় যথাক্রমে ১২৮ ও ৬৭৮।

সর্বাধিক সময়কালের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে উৎপাদন শিল্পের বাইরে উচ্চ শিক্ষা তথা গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রেও অতীতে একই ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল।

এই রাজ্যের শিল্পপতিদের মতো প্রখ্যাত রাশিবিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একবার তাঁরই হাতে গড়া ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটের কর্মীরা প্রতিষ্ঠানে থেকে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রবল বাধার সৃষ্টি করায় প্রফেসর কিছুদিন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে একটা স্যুট ভাড়া নিয়ে কাজ করেছিলেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় সেখানে একদিন তিনি জ্যোতিবাবুর কাছে এই ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করলে জ্যোতিবাবু সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন এক্ষেত্রে তিনি হস্তক্ষেপ করলে সেটা হবে পার্টির নীতির বিরুদ্ধে যাওয়া। তাই তিনি পারবেন না।

জ্যোতিবাবুর এহেন অবস্থান কতটা শ্রমিক স্বার্থে আর কতটাই-বা দলের স্বার্থে সেটা রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হলেও রাজ্যের সামগ্রিক ক্ষেত্রে যে আত্মঘাতী সেটা বলাই যায়।

পতনের রাশ টানার ব্যর্থ চেষ্টা

বিচিত্রানুষ্ঠানে কৌতুকাভিনয় প্রদর্শনের জন্য ক্লাবের আয়োজকরা কৌতুক শিল্পী জহর রায়কে কিছু অগ্রিম অর্থ দিয়ে এসেছিল। পরে অনুষ্ঠান বাতিল হলে তারা জহরবাবুর কাছে সেই টাকা চাইতে গেলে শিল্পী স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে টুথপেস্টের টিউব থেকে কিছুটা পেস্ট বার করে তাদের সেই পেস্ট আবার টিউবে ঢোকাতে বলেন। মধ্যনব্বইতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর বামফ্রন্টের বৈঠক ব্যতিরেকেই নয়া শিল্পনীতি ঘোষণার মাধ্যমে শিল্পায়নের প্রয়াসকেও টুথপেস্ট সিনড্রোম আখ্যা দেওয়া যায়।

১৯৯৫-তে একদা কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির শতবর্ষের অনুষ্ঠানে WBIDC-র চেয়ারম্যান সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে নবশিল্পায়নের উদ্দেশে এরাজ্যের গৌরবময় অতীত, শিক্ষিত শ্রমিক, প্রাকৃতিক সম্পদ, রাজনৈতিক স্থায়িত্বের কথা বলেও একটিও মৌ স্বাক্ষর করাতে পারেননি। অন্যদিকে কর্ণাটক টেকনোলজিক্যাল পার্ক, দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা এবং একটি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের তিনটি মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করে। অন্য রাজ্যগুলির মধ্যে হরিয়ানা সিঙ্গাপুর কনসোর্টিয়ামের সাথে ৭০ একর

টেকনোলজিক্যাল পার্ক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের এশিয়া প্যাশিফিক ফুড এক জয়েন্ট ভেঞ্চার স্বাক্ষর করে। উরিষ্যা পায় সিঙ্গাপুরেরই এজিয়ো কাউন্টার ট্রেড ও ভারতের ভিটল গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে পারাদ্বীপে নতুন ইমপোর্ট টারমিনাল। স্বভাবতই খালি হাতে আয়োজক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু এই সব দেখে অসন্তোষ চেপে রাখতে না পেরে মুখ্যমন্ত্রীদের এই বাড়তি সুবিধে দেওয়ার হাতছানি বন্ধ করার আহ্বান জানান। এটা ঠিকই competitive fiscal federalism একটা জিরো সাম গেম। কিন্তু ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সবুজ চারণভূমির সন্ধান করাও স্বাভাবিক প্রবণতা।

NRI জন স্বরাজ পল এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র কেনাবেচার কমিশন এজেন্ট হিন্দুজারাও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন তাঁদের এখানে বিনিয়োগের কোনো ইচ্ছে নেই।

শিল্প পরিকাঠামো ছাড়া কলকাতা বন্দরের আন্তর্জলিও এ রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে আরও জটিল করে তুলেছে। নতুন শতকের গোড়া থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শিল্প উন্মাদনা শালবনিতে সফল হলেও সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ওয়াটার্লুর মুখোমুখি হয়েছে। পরবর্তী দুই দশক ধরে চলছে অনুর্বর এই বঙ্গ মানচিত্রে এক প্রলম্বিত শিল্প বন্ধ্যাত্ব। বৃহৎ শালপ্রাংশুদের অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র গোয়েঙ্কা, নেয়োটিয়াদের মতো ভেরেন্ডারাই বৃক্ষ হতে চাইছে।

সত্যরে লও সহজে

শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা পরিবহণ সবগুলোই পরস্পর সম্পর্কিত। এমনকী সাহিত্য খেলাধূলার মতো বিষয়গুলোও উন্নয়ন নিরপেক্ষ নয়। সত্তরের দশকে ভারত যখন কোরিয়ার চেয়ে অনেক বেশি টেক্সটাইল রপ্তানি করত তখন কেরিয়াকে সহজেই ফুটবলেও হারাতো। উন্নয়ন একটা ধারাবাহিক ঘটনার ফসল। প্রথম ফরেন সেক্রেটারি কে পি এ মেনন তাঁর মেময়ারস অ্যান্ড মিউসিংস-এ লিখেছেন, 'কেরালায় ক্যালকাটা থেকে কাগজ এলে আমরা তাকিয়ে থাকতাম কার্জনের ক্যালকাটার খবরের জন্য। ভারতে যেটাই প্রথম আসত বা ঘটত সেটাই হতো ক্যালকাটায়।' আমাদের আলোচনার সময়কালটিতে দেখলাম কার্জনের ক্যালকাটা কেবল নামের বদলই ঘটায়নি, ঘটে গেছে ধারাবাহিক অবরোহণ।

স্বামী হিরন্ময়ানন্দের গল্পে কাশীর ঘাটে সন্ন্যাসীর হাত থেকে পড়ে যাওয়া কমণ্ডলুর গঙ্গাপ্রাপ্তির মতো। বিশিল্পায়ন এখানে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, রাজনীতি-সহ বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে রাতারাতি মুক্তি অসম্ভব। এমন নয় যে এক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখব এই রাজ্য আবার শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য হয়ে গেছে এবং নব কিশলয়ের মতো তার ছোঁয়া লেগেছে সর্বাঙ্গে। এটা সুদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। তার কারণগুলো একে একে চিহ্নিত করা যাক।

এক, পশ্চিমবঙ্গই ভারতে ভৌগোলিক ভাবে সবচেয়ে প্রতিবন্ধী রাজ্য। অষ্টাবক্র মানচিত্রের রাজ্যটির একমেবাদ্বিতীয়ম্ শহর কলকাতায় আলিপুরদুয়ার থেকে আসতে লাগে ১৮ ঘণ্টা। অথচ কটক, পাটনা বা বিলাসপুর থেকে লাগে সাত ঘণ্টা।

দুই, পশ্চিমবঙ্গই এদেশে একমাত্র রাজ্য যেখানে আছে একটি ইসলামিক দেশের সঙ্গে দীর্ঘতম জনবহুল আন্তর্জাতিক সীমানা।

তিন, রাজনৈতিক অবিমৃশ্যকারিতার দরুন বিশ্বে বৃহত্তম গণপ্রচরণ ঘটায় এখানে অর্থনীতি সবচেয়ে বিঘ্নিত হয়েছে।

চার, দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে ভোট এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বার্থে প্রতিবেশী দেশ থেকে বেআইনি সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকে পরোক্ষ সমর্থন করে রাজ্যের ডেমোগ্রাফিক ভারসাম্যে ভয়াবহ বদল ঘটানো হয়েছে।

পাঁচ, গত দু দশক সময়কালে এই রাজ্যে খুচরো ব্যবসা, পরিবহণ এবং অন্যান্য অসংগঠিত সেবার ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যায় বিহারবাসীর অংশগ্রহণ ঘটেছে। দার্জিলিং, মণিপুর, সমগ্র ডুয়ার্স ও সিকিমে সমৃদ্ধ বিহারবাসীদের এহেন অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্প্রতি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের এক সাক্ষাৎকারেও উঠে এসেছে। হিন্দি সম্প্রসারণের এই আতঙ্ক এবার ভোটেও প্রভাব ফেলেছে।

ছয়, এখানে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের অভাব। উপরিউল্লিখিত প্রতিটি বিষয় সামগ্রিকভাবে এক আত্মঘাতী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কমপিউটারের ভাষায় বলা যায় এ রাজ্য একটা লুপে পড়ে গেছে।

আশির দশকের মাঝামাঝি হোপ-৮৬ থেকে শাখা সংগঠনগুলির বিলয় ঘটার পর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী, খাটাল কর্মচারী, অটোচালক ছাড়া যে ক্লাব নির্ভরতা দেখা দিয়েছিল সেটাই এখন ভোট বৈতরণী পার হওয়ার একমাত্র অবলম্বন। প্রায় শিল্পশূন্য রাজ্যে এখন লকআউট এবং বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই বললেই হয়। কেবল অর্ধেক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট কলেজই কেবল উঠে যায়নি, ছাত্রশূন্য স্কুল-কলেজে সামনের দিনে সর্বক্ষণের শিক্ষক নিয়োগও পাঁচ লক্ষ কোটি ঋণের ফাঁদে আঁটকে থাকা রাজ্য সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

এহেন কোনো বন্ধ্যা শিল্প মানচিত্র কোনো বিনিয়োগকারীর কাছেই উর্বর ক্ষেত্র হতে পারে না। ১৯৭৭ থেকে উগ্র কেন্দ্র বিরোধিতা যেখানে লোভনীয় রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড দেয় সেখানে শাসকের কাছে উন্নয়নের প্যাশন আশা করাই ভুল। সেই সঙ্গে সাচার কমিশনের সত্যতা মেনে উন্নয়নের পথে না গিয়েও যদি তিরিশ শতাংশ ভোট ফিক্সড ডিপোজিটের মতো থাকে আর তার সাথে সুদ হিসাবে কিছু বাড়তি ভোট আসে তা হলে তো সোনায় সোহাগা। উন্নয়ন যে রাজ্যে তলানিতে সেখানে কিছু 'শ্রী' ও 'সাথী' যুক্ত কর্মসূচিকেই মানুষ অনবদ্য সাফল্য ভাবতে বাধ্য।

বর্তমানে এ রাজ্যের নগরাঞ্চলের আলোকপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারিবারিক জনবিন্যাসের বদল পাড়ায় পাড়ায় জন কোলাহলহীন বৃদ্ধাবাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। নিকট ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী সাধ্যমতো অন্য অগ্রণী রাজ্যে বা দেশে ধাবিত হবে। এখানে থাকবে কেবল পালক ছাড়ানো বা লোম ওঠা গৃহপালিতরা। তারা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা ভাবতেই পারবে না। ছড়ানো তণ্ডুলের পিছনে আহ্লাদিত হয়ে ছুটবে। সেদিনের কথা ভাবলে মনে হতে বাধ্য, ভাগ্যিস তখন আমরা থাকবো না! □

প্রাথমিক শিক্ষায় এগিয়ে বাংলা, পিছিয়ে শিক্ষকেরা

জাহ্নবী রায়

আমাদের রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রথম। গর্ব করার মতো বিষয় বটে। কিন্তু এর নেপথ্যে যাঁরা, যাঁদের হাত ধরে গর্বের এই ঘটনাটা ঘটল, সেই সব প্রাথমিক শিক্ষকরা কেমন সম্মান পান আমাদের এই রাজ্যে। একটু দেখা যাক।

আমাদের রাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই বেশ কয়েকটি প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন পিআরটি

স্কেলের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা তাঁদের মতে একটা ন্যায্য অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এই পিআরটি স্কেল কী? সর্ব ভারতীয় স্তরে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হার। যে বৈষম্যের কারণে আমাদের রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অনেকটাই। একটা সময়ে এই বিষয়টি নিয়ে লাগাতার পথে নেমে আন্দোলন করেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সেই সব শিক্ষকদের গায়ে তকমা সেঁটে দিয়েছিলেন 'অযোগ্য' বলে। পুলিশের লাঠির আঘাত, জল কামানের গোলা আছড়ে পড়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর। এই আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে ছিলেন বহু সিনিয়র শিক্ষক। তাঁদেরও অন্য ভাবে অযোগ্য শিরোপা দিতে জিভে কামড় খাননি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। কই তিনি তো শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনের কথা বললেননি? তিনি অবশ্য নজরুল মঞ্চের এক সভায় বলেছিলেন, তাঁর সরকার সরকারি পয়সায় ডিএলএড পাশ করিয়ে যোগ্যতা বাড়িয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষকদের। সেই বাড়ানো যোগ্যতা কি ধুয়ে খাবেন শিক্ষকরা? সাকুল্যে একটা গ্রেড মারফত মাত্র ৩০০ টাকা বেড়েছিল। কিন্তু আজও তাঁদের যোগ্যতা খাতায় কলমে মাধ্যমিক। যার ফলে তাঁরা আজও পান সেই যোগ্যতার বেতন। যদিও একটি নির্দেশ মারফত রাজ্যের প্রত্যেক শিক্ষককে উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০ শতাংশের গণ্ডি পেরোতে হয়েছে। অনেককে বৃদ্ধ বয়েসে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ৫০ শতাংশ নম্বরের গণ্ডি পেরোতে হয়েছে। তবুও মেলেনি উচ্চতর বেতন কাঠামো। মাস পয়লায় বেতনের কথা বর্তমান রাজ্যের শাসক দল বলে থাকে। কী এমন আহামরি কাজ তাঁরা করেছেন? এর আগের বাম সরকার ছাগলের চতুর্থ ছানা হিসেবে ভেবে, রাজ্যের সমস্ত কর্মীর বেতন দেওয়া হয়ে গেলে, তারপর প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দিত। ফলে প্রাথমিক শিক্ষকদের মনে গেঁথে গিয়েছিল যে, তাঁদের মাস পয়লা ওই ২৯ কী ৩০ তারিখ। বঞ্চনা কিন্তু একই ছিল। অন্য সরকারি কর্মীরা যে সব সুবিধা পান, প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কিছুই নেই।

এবার আসা যাক প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিষয়ে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কথায়। এখানে প্রভিডেন্ট ফান্ড কিন্তু জমা হয় না শিক্ষকের ব্যক্তিগত পিএফ অ্যাকাউন্টে। একটি সূত্র জানাচ্ছে, যে ওই টাকা জমা পড়ে সংসদ চেয়ারম্যানের নামে। তিনি সই বা কৃপা না করলে একজন শিক্ষক অবসরের পর তাঁর পিএফ-এর জমা টাকা পাবেন না। যদি একটু বাঁকা চোখে বলা যায়, এটা কি বাস্তব সম্মত? এটা কি ঠিক? যেখানে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীরা অবসরের আগের দিনই পেয়ে যান পিএফ ও গ্র্যাচুয়িটির সমস্ত টাকা। এমনকী মাদ্রাসা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একটি সূত্র মারফত বেশ কয়েকটি এই ধরনের কেসের কথা জানা গেছে যে, বর্তমান কলকাতা প্রাথমিক সংসদ চেয়ারম্যান পুরসভার প্রার্থী হিসেবে তাঁর নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, অবসর নেওয়া শিক্ষকদের পিএফের টাকা পেতে বেশ খানিকটা বিলম্ব হয়েছে। সঙ্গে গ্র্যাচুয়িটির টাকাটা পেতেও। শেষ জীবনে এসেও অবহেলার শিকার হতে হচ্ছে একজন প্রাথমিক শিক্ষককে।

এবার আসা যাক, একজন সদ্য অবসর পাওয়া শিক্ষকের বিষয়ে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীরা অবসরের পরের মাস থেকেই পেনশন পেতে শুরু করেন। অথচ একজন প্রাথমিক শিক্ষক সেই পেনশন পান অবসর গ্রহণের দুই থেকে তিন মাস পর। এছাড়াও নানা টাল বাহানায় তাঁকে ঘোরানো হয়। এখানে আবার এই পেনশন ফাইল পাশ করিয়ে দেবার জন্য কিছু সহৃদয় মানুষ আছেন, যারা সামান্য ভালোবাসার বিনিময়ে ফাইলে আনেন দ্রুতগতি। একথা প্রকাশ্যে আসে না। বঞ্চনা আর বঞ্চনা, সেই বাম আমল থেকে আজকের তৃণমূল আমল, সরকারি ব্যবস্থায় ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরির কারিগরদের সারা জীবন ধরে যে শোষণ আর নিষ্পেষণের প্রক্রিয়া চলে, তা হয়তো বিশ্বে একেবারে প্রথম সারিতে থাকার দাবি রাখে। □

ভারতীয় সংবিধানে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে

দেখতে দেখতে ভারতীয় গণতন্ত্র ৭২ বছর অতিক্রমের পথে। গণতন্ত্রের চলার পথে সময়টা বড়ো কম নয়। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ আমাদের স্বাধীন হয়েছিল বটে তবুও মাউন্টব্যাটেনের মাধ্যমে, তৎকালীন ব্রিটিশরাজ ষষ্ঠ জর্জের হাতে ছিল। ভারতবর্ষ শাসিত হচ্ছিল ইংরেজদের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে। বলতে গেলে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী এমন একটি দিন, যেদিন আমরা সম্পূর্ণ ইংরেজ শাসন মুক্ত হই। এদিনই ভারতবর্ষ বিশ্বে একটি গণতান্ত্রিক সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয় এবং ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার নেন শ্রদ্ধেয় বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ। সংবিধান একটি ছোট্ট শব্দ হলেও এর রূপায়ণে রয়েছে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম। এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর। তিনিই ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান।

তিনি ছাড়াও আরও ৬ জন সদস্য ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে এন গোপাল স্বামী, আল্লাদি কৃষ্ণ স্বামী কে এম মুন্সী, মহম্মদ সাদুল্লা, বিএল মিত্র ও ডি এল খৈতান। মূলত তাঁদের সকলের সম্মিলিত অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল আমাদের সংবিধান। ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন ধরে অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন, অনেক দেশের সংবিধান পর্যালোচনা, বহু বিতর্ক, পরামর্শ, সংশোধনী এবং ১৬৬টি গণ পরিষদ অধিবেশনের মন্থনজাত অমৃত আমাদের এই সংবিধান। অলংকরণের মূল দায়িত্বে ছিলেন আমাদেরই বাঙ্গলার প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু। লেখনীতে ছিলেন প্রেমবিহারীজী। মূল লিখিত সংবিধানে বিভিন্ন আইন কানুন, বিবিধ নাগরিক অধিকার-সহ ছত্রে ছত্রে রয়েছে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ। সেকুলার সেকুলার বলে যাঁরা চিলচিৎকার করেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় ইতিহাসের কালখণ্ড ছাড়াও রয়েছে বৈদিক আশ্রম, ঋষি সংস্কৃতি স্নাত গুরুকুল পরম্পরা, পবিত্র গঙ্গার মর্ত্য অবতরণ। রয়েছেন লক্ষণ, সীতা-সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, গীতোপদেশরত শ্রীকৃষ্ণ। রয়েছে মহাভারত, ভগবতগীতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ, নৃত্যরত নটরাজ প্রভৃতি। ভারতীয় সংবিধানে মহাবীর শিবাজী মহারাজ সগৌরবে থাকলেও নরাধম আওরঙ্গজেবকে কোনও স্থান দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর বামমার্গী তথাকথিত ঐতিহাসিক ভারতীয় সংবিধানকে হিন্দু সংস্কৃতি বর্জিত সেকুলার গ্রন্থ প্রমাণে ধারাবাহিক অপপ্রচার চালিয়ে গেছেন, আজও চালাচ্ছেন। প্রয়োজন ছাড়াও বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বারবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে 'সোশ্যালিস্ট' ও 'সেকুলার' শব্দটির প্রবেশ ঘটে। সংবিধান এমনই একটি পবিত্র গ্রন্থ যা আমাদের দেশ এবং দেশীয় জীবনকে চালনা করে। পরাধীনতার অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সাম্য, মৈত্রী, ন্যায়, স্বাধীনতার বলে বলীয়ান হওয়ার শক্তি দেয় আমাদের সংবিধান। আমাদের গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে 'মানুষের দ্বারা মানুষের জন্য' হয়ে ওঠে।

—মন্দার গোস্বামী,
খাগড়া, বহরমপুর।

সম্পাদনায় ত্রুটি

৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখের স্বস্তিকাতে নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনায় লিখেছেন, ২০১৯-এ বিজেপর বিরুদ্ধে ২০৪ আসনে লড়ে কংগ্রেস জেতে মাত্র ৬টি আসন। ওই একই তারিখের স্বস্তিকাতে 'অতিথি কলম'-এর নিবন্ধে জয়তীর্থ রাও ড. মনমোহন সিংহকে 'প্রয়াত' বলে উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত তথ্য দুটি ঠিক নয়।

২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ৫২ আসনে জিতেছে। ড. মনমোহন সিংহ প্রয়াত নন, এখনও জীবিত।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে কেন?

বাংলাদেশে সেখানকার সংখ্যালঘু সমাজের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন, নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। দুষ্কৃতীরা বুক বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ প্রশাসন নির্বিকার। এতে দুর্বৃত্তদের সাহস ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হিন্দু কন্যা অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ অবাধে চলছে। পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার রয়েছে। হিন্দুমন্দির অপবিত্র করা, বিগ্রহ-সহ মন্দির ভাঙা, দেবোত্তর সম্পত্তি, শশ্মানঘাট দখল করা, সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ভাঙা ও দখল করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। দুষ্কৃতীদের কোনও সাজা হয় না। কারণ পুলিশ প্রশাসন কোনো অভিযোগ স্বীকার করে না। বিগত দুর্গাপূজোর সময় থেকে বাংলাদেশে যে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে সেটা কমার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, কারণ প্রশাসনের নিস্পৃহতা। অর্থাৎ যেমন চলছে চলুক। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কোনও বিকার নেই। তারা নিজেদের সাংসারিক কাজকর্ম, খাওয়াদাওয়া, গানবাজনা, পিকনিক, ভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে বড়োই ব্যস্ত। অথচ অতি আশ্চর্যের, এদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষরা পূর্বপাকিস্তান/ বাংলাদেশে অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নৃশংসভাবে নিহত হতে দেখে আর নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের অপহৃতা হতে দেখে আর পরে তাদের উদ্ধার করতে না পেরে নিজেদের পৈতৃক ভিটেমাটি, বিষয় সম্পত্তি সব কিছু ফেলে রেখে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে রাতের অন্ধকারে এক বস্ত্রে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে। অথচ এদের বংশধররা সেসব কিছু বিস্মৃত হয়ে মিটিং, মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে— 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, ভেদ নাই ভেদ নাই', আর গান গাইছে 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু

মুসলমান'। এদের অনেকে আবার মুসলমান জামাই ঘরে আনতে দ্বিধা করছে না।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার।

এক যে আছে যমজ কন্যা

আজ ইতিহাসখ্যাত যমজ অগ্নি কন্যাদ্বয়ের কথা বলব। তাদের যমজ না বলে ঠিক যমজের মতো বলা যায়। বিপ্লবী অগ্নি কন্যাদের মতো তারাও ছিল বিপ্লবের আধার। তারা সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ না দিলেও তাদের দুজনের নাম বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখা অসম্ভব। ইতিহাস খ্যাত সেই কন্যাদ্বয়ের নাম গোল দিঘি আর লাল দিঘি। তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম দুই কেন্দ্র বিন্দু ছিল ওই দুই দিঘি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সামনে আছে গোল দিঘি। এখনো আছে। গোলাকার আকৃতির জন্যে তার এই নামকরণ হয়। তবে তার চরিত্র এখন পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে সুইমিং পুল। ধনীর দুলালরা আয়েশ করে আজ সাঁতার কাটে সেখানে। তখন ব্রিটিশ রাজত্বে ইংরেজ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু ছিল ওই গোল দিঘি। ছাত্র, ছাত্রীরা ইউনিভার্সিটি থেকে মিটিং, মিছিল করে ওই দিঘির পাড়ে জড়ো হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্লোগান, সাউটিং করতেন। কত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্ম দেখেছিল সে। অগ্নি যুগের কত উথাল পাথাল স্বাধীনতা সংগ্রামের সাক্ষী সে। তখন গোল দিঘি মানে ছিল কেবল বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। সে ইংরেজদের কাছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। কত ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে আজ সে কেমন নীরব। আজও সেখানে ইউনিভার্সিটির সামনে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে ছাত্র-ছাত্রীরা জমা হয়ে ছাত্র আন্দোলনে শামিল হয়। তখন ছাত্র আন্দোলনের মূল মন্ত্র ছিল স্বদেশি ভাবনা। আর এখন ছাত্র আন্দোলন মানে শুধু নিজেদের আখের গোছানো। হায় ছাত্র আন্দোলন তোমার এখন দিন গেছে।

লাল দিঘি। সুন্দর নাম বটে। তখন শীতকালে লাল শালুকে ভরে থাকত ওই দিঘি। তাই নাম হয় লাল দিঘি। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে সশরীরে এখনো সে হাজির, এই শীতে শালুক ফুটুক বা না ফুটুক। ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের জন্মদাত্রী ওই লাল দিঘি। স্বদেশিরা আন্দোলন করতে জড়ো হতেন ওই দিঘির পাড়ে ঠিক রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে। ওইখানেই বসতেন বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের বড়লাট। ভাবা যায়, সেখান থেকে সারা দেশ শাসন করতেন। স্বদেশিদের ভয়ে ভারতবর্ষের তৎকালীন বড়লাট কার্জন বাধ্য হয়ে ১৯১৯ সালে বাঙ্গলা থেকে দিল্লিতে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। স্থানান্তরিত না করে কোনো উপায় ছিল না। যদি তারা থাকত দিঘির জল লালে লাল হয়ে উঠতো। দুই দিঘির পাড়ে তাদের কত সমাধি দেখতাম। তখন অনেক অত্যাচারী ইংরেজ প্রাণ বাঁচাতে ভয়ে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। লাল দিঘি তার সাক্ষী আছে। তারা কখনো ভুলতে পারে ১৯৩০ সালে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তিন বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ যুদ্ধের কথা? বিপ্লবীদের হাতে গুলি খেয়ে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর অত্যাচারী কর্নেল সিম্পসন প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। ইতিহাস খ্যাত ওই অলিন্দ যুদ্ধের স্মরণে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে তৈরি হয় বি বা দি বাগ। আনন্দ আর গর্ব দিয়ে তৈরি ওই স্মৃতি সৌধ।

দুই দিঘির ইতিহাস নিয়ে আমাদের গর্বে বুক ভরে ওঠে। যখন ওই দিঘির পাড় দিয়ে যাই, মনে হয় এক জীবন্ত ইতিহাসের আমি মুখোমুখি হই। ইতিহাস এক লহমায় জীবন্ত হয়ে উঠে আমার সঙ্গে কথা বলে। তখন ওই দিঘিদ্বয়কে যমজ বৃদ্ধা কন্যাদ্বয় বলে মনে হয়। তারা হয়তো বেঁচে থাকলে তাদের খ্যাতি আর খাতির নিয়ে আগামী প্রজন্মের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি তস্য ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিদের কাছে বীরত্বের গল্প শোনাবার জন্যে। তারাও রোমাঞ্চিত হবে আমাদের মতো। সে কী রোমাঞ্চ। এ কী গর্ব।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ঐশ্বর্যকে তলব, জয়ার অভিশাপ

ঐশ্বর্য রাইকে ইডি পানামা পেপার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করায় ব্যাপক চটেছেন তার শাশুড়ি-মা জয়া বচ্চন। সম্প্রতি তিনি সংসদে বিজেপির কার্যকর্তাদের এর জন্য অভিশাপ দেন। বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেন, 'বিজেপির ভরাডুবির সময় শুরু হয়ে গেছে। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি শেষ হয়ে যাবে।'

প্রশ্ন হলো, তিনি চটলেন কেন? উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই কি? দুর্নীতির সঙ্গে তার পরিবারের যোগাযোগ এই প্রথম নয়। এর আগেও অমর সিংহের সহায়তায় উত্তরপ্রদেশে নামে-বেনামে প্রচুর জমি কেনার জন্য অমিতাভ বচ্চনের নাম খবরের শিরোনামে এসেছে। জয়া সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করলেও সংসদে দাঁড়িয়ে অভিশাপ দেননি। কিন্তু এবার তিনি মাত্রা ছাড়িয়েছেন। ভুলে গেছেন, ইডি একটি দুর্নীতির মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঐশ্বর্যকে ডেকেছে, গ্রেপ্তার করেনি। তাহলে এত গোঁসা কেন? জয়া কি চান না অপরাধীরা ধরা পড়ুক। না কি, তিনি কোনও সত্য গোপন করতে চাইছেন? যে সত্য প্রকাশিত হলে তার দল উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়বে।

—সিদ্ধার্থ বটব্যাল,
কল্যাণী, নদীয়া।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কী হলো

কয়েকদিন আগে এক স্বনামধন্য ডাক্তারবাবুর ইউটিউব ভিডিয়ো দেখলাম। তাতে তিনি বেশ খোলসা করেই জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যসাথী কীভাবে ডুবল। ভিডিও থেকেই জানতে পারলাম এখন নাকি কলকতার বেসরকারি হাসপাতালগুলো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতে জিজ্ঞাসা করেও এ ব্যাপারে কোনও সদুত্তর পাইনি। তাই স্বস্তিকার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই চিঠি লিখছি। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি আলোকপাত করেন তাহলে বাধিত হব।

—শান্তনু পাল,
আউশগ্রাম, বর্ধমান।

রেলের বিকিকিনিতে মেয়েরা

নন্দিতা দত্ত

যে কোনও কাজের ক্ষেত্রেই নারীর কাজ বা পুরুষের কাজ সমাজ ভাগ করে দেয়। রেলের হকার আর মালবাহক রূপে পুরুষদেরই একচ্ছত্র ভাবে দেখা যেত। মালবাহকদের ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন না হলেও হকারির ক্ষেত্রে মেয়েরা আজ কিছুটা জায়গা নিয়ে নিয়েছেন। রাস্তার ফুলবিক্রির ক্ষেত্রে মেয়েদেরই বেশি দেখা যায়, তেমনই ট্রেনে ঝালমুড়ি, চা, কফি, সিঙ্গাড়া, টিফিন নিয়ে ট্রেনের কামরা থেকে কামরায় ছেলেদের হকারি করতে দেখা যায়। হকারি বা

ফেরি করে সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে রেলপথ ছেড়ে রাস্তায়ও ছেলেদেরই দেখা যেত। রাস্তা ছেড়ে ট্রেনে হকারি শুরু হলে বিবর্তন দেখা দিল। রমা দেববর্মা নিজের বাড়ির উদ্ধৃত ঢেকিশাক, মোচা, কুমড়া ইত্যাদি ফসল পেঁচারথল রেলস্টেশনে নিয়ে বসে বিক্রি শুরু করেন। অবশ্য অসম-আগরতলা রোডে রাস্তার ধারে জনজাতি মহিলাদের জুমের ফসল নিয়ে বিক্রি করতে দেখেছি অনেক আগেই। পেঁচারথল স্টেশনে সবজি, আমবাসায় কলা, নালকাটায় আনারস নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে বিক্রি বা স্টেশনে ট্রেন থামার পর কামরায় উঠে বা জানলা দিয়েই সবজি বিক্রি যারা করছেন, তাদের অনেকের কাছে এই পেশাটা নতুন। একটা স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে তারা যান না।

তবে ফেরিওয়ালা বা বিভিন্ন কোম্পানির লোকজন বাড়ি এসে যেভাবে তোষামোদ করে তাদের পণ্য কেনার জন্য, রেলের ক্ষেত্রে তা একটু ভিন্ন। মানুষ প্রয়োজনেই জল, ফল, খাবার, সবজি কিনে নেন। যারা নিত্য আসা-যাওয়া করেন তাদের অনেকেই সবজি এবং মরসুমি ফল ট্রেন থেকেই কিনে নেন। আগরতলা- ধর্মনগর-রেল রুটে মেয়ে হকারদের পসরা নিয়ে বসতে দেখেই আমরা অভ্যস্ত। এর আগে অসম-আগরতলা রোডে জুমের ফসল আর অর্জুনফুল গাছ (যা থেকে ঝাড়ু তৈরি হয়) বিক্রি করতে দেখেছি। মূলত জনজাতি পরিবারের মেয়েদেরই দেখা যেত। রেলে প্ল্যাটফর্মে এখন শুধু জনজাতি পরিবারের মেয়েরাই সবজি নিয়ে বসে না। স্টেশন চত্বরে এই খাবারের স্টলগুলিতে চা-টিফিন ছাড়াও সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও বিক্রি করেন।

রেলের কামরায় মেয়েরা পসরা নিয়ে হেঁকে ফেরি করছেন এ দৃশ্যটা পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া ও শিয়ালদহ লাইনে বহুকাল ধরে দেখা যায়, আবার চেন্নাইতে স্টেশন চত্বরে বা কামরায় উঠে পুতুল, ফুল, বাদাম বিক্রি করতে মেয়েদের দেখা যায়। কিন্তু প্রথম প্রথম মেয়েদের পক্ষে বেশ অসুবিধাজনক ছিল রেলে হকারি করা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কালে প্রচুর উদ্বাস্তু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন। মানুষের জীবন জীবিকা তখন অনিশ্চিত ছিল। দেশভাগের ফলে বার বার বাস্তুচ্যুত মানুষকে নতুন করে বাঁচার লড়াইয়ে পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে। ধীরে ধীরে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা রেলে চাল পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এ কাজের মধ্য দিয়ে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা ট্রেনে চলাচলে সাবলীল হয়। নিম্নবিত্ত মেয়েরা সংসার চালাতে গিয়ে চালপাচারের সঙ্গে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হয়নি। ঝুঁকিপূর্ণ এ জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে আর্থিক অবস্থা সামাল দেবার জন্য অন্য কাজ খোঁজার ক্ষেত্রে অনেক মেয়েই প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা পাড়ি দেয় ট্রেনে বাড়ির কাজের লোক হিসেবে। এ পেশায় এখনও অনেক মেয়েই ট্রেনে পাড়ি দেয় কয়েক মাইল। আর্থ-সামাজিক কারণে মেয়েরা স্বাধীনভাবে রোজগেরে হতে চাইলেই কি আর সুস্থ সামাজিক জীবন পায়? অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় আর্থিক দুর্বলতার পাশাপাশি অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মেয়েদের কাজ নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে না। সেই কঠিন লড়াইয়ে পুরুষ হকারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় মেয়েদের। মেয়ে হকারদের সেই জায়গাটা তৈরি করতে বেশ সময় লেগেছে।

পুরুষ হকারদের সঙ্গে কি চলন্ত ট্রেনে হকারি করতে অসুবিধা হয়? কেন তারা থেমে থাকা ট্রেনেই হকারি করেন? প্রশ্নটার সরাসরি উত্তর পাওয়া যায়নি। একটু ঘুরিয়ে শিখা পাল বললেন—'বইলে যে ব্যবসা হয় চলন্ত গাড়িতে একই ব্যবসা হইব বা একটু বেশি হইত এমন না। কিন্তু আমরা যাই না। স্টেশনে তো কত ট্রেন দেরি কইর‍্যা ছাড়লেও আমরা আসা যাওয়া করি না।' তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে এরা ছেলেদের মতো এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে যাওয়ার পরিবর্তে ট্রেন ছাড়ার আগে ট্রেনে ফেরি করে নিশ্চিন্তে ঘরে ফেরে নিজেদের সুবিধা মতো। কয়েকটি ট্রেনের মাঝে যাত্রা বিরতিতে নিজেরা বাড়িঘরে গিয়ে ঘরকন্নার কাজটাও সেরে আসতে পারে। □

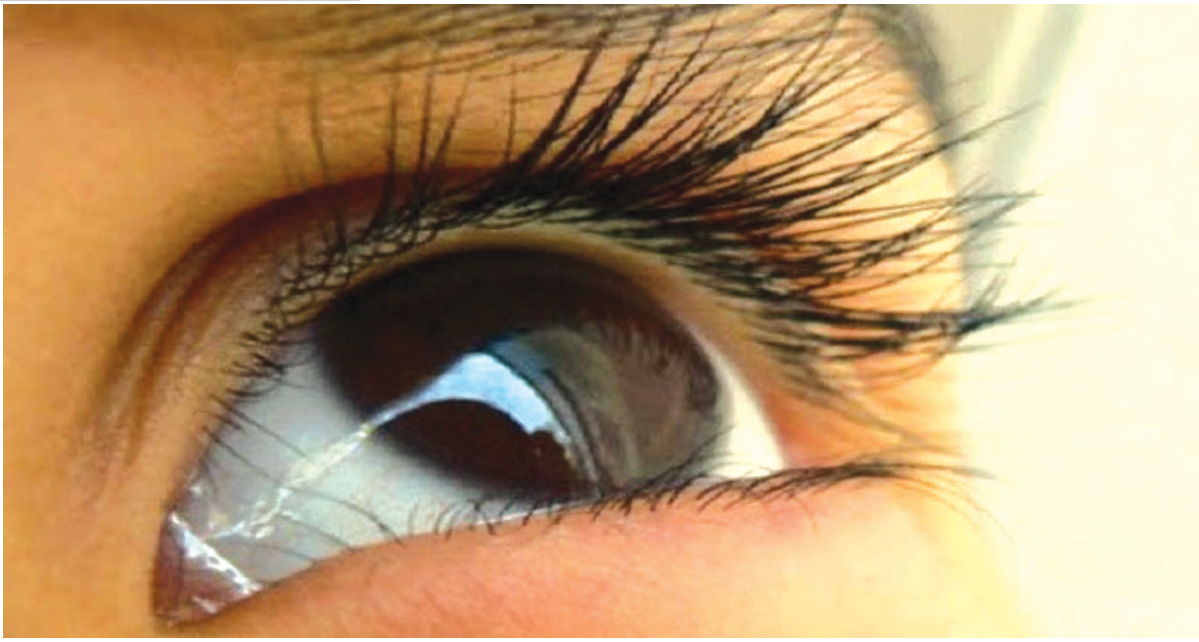

চোখের পাতা কাঁপা ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

চোখের পাতা কেঁপেই যাচ্ছে? ভালো বা খারাপ হতে চলেছে, এ জাতীয় কুচিন্তায় না ভুগে সবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হতে পারে কোনও জটিল অসুখের বিপদসংকেত। চোখের পাতা কাঁপার সঙ্গে মানুষের সংস্কারবোধ অতি প্রবল হয়ে ওঠে। কোন চোখ কাঁপলে ভালো, আর কোন চোখ কাঁপলে খারাপ ইত্যাদি নানাবিধ অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে ফেলি। কিন্তু বাস্তবিক জানেন কি, চোখের পাতা কাঁপা মানে বেশ কিছু বিপদসংকেত হতে পারে। জ্বর, সর্দি, কাশির মতো চোখের পাতা কাঁপাও বাইরের লক্ষণ হতে পারে। আসল লক্ষণটা হয়তো আরও গভীরে রয়েছে। তবে বাম চোখ কাঁপতে থাকা মানে সমস্যাটা আরও প্রকট। না, শুধু সংস্কারের কথা বলছি না।

বরং দেহগতভাবে দেখতে গেলে কিংবা বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে বাম বা ডান চোখ কাঁপা মানে অনেক কিছু বিপদসংকেত। বিজ্ঞান জানাচ্ছে, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণেই চোখের পাতা কাঁপে। চোখের পাতা লাফানো আসলে এক ধরনের অসুখ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় মাফোকিমিয়া পেশির সংকোচনে চোখের পাতা লাফায়। শুধু একবার হঠাৎ করে চোখের পাতা লাফালে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু যদি এই পাতা লাফানো চলতেই থাকে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি। চিকিৎসকদের গিয়ে জানাতে হবে, এই সমস্যার কথা। তবে মোটামুটি কী কী কারণে চোখের পাতা কাঁপতে পারে, তার কিছু জরুরি তথ্য জানা যাক। দৃষ্টিতলে কোনও সমস্যা থাকলে চোখের ওপর চাপ পড়তে পারে। টিভি, কম্পিউটার, মোবাইলের আলোও চোখের দৃষ্টিতে প্রভাব ফেলতে পারে। আর এই সমস্যা থেকে চোখের পাতা লাফানোর মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে, চোখের কনট্যাক্ট লেন্স ঠিকমতো কাজ না করলে কিংবা বয়সজনিত কারণে চোখ শুকিয়ে যেতে পারে। এ কারণে চোখের পাতা লাফাতে পারে।

কঠিন মানসিক চাপের কারণে চোখের পাতা লাফাতে পারে, চোখে জ্বালাও করতে পারে। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব বা অন্য কোনও কারণেও চোখের পাতা লাফাতে পারে। ঘুমের অভাবে চোখের পাতা লাফালে ঘুম ঠিকঠাক হলে লাফানো বন্ধ হয়ে যাবে।

শরীর ঠিকঠাকমতো পুষ্টি না পেলে চোখের পাতা লাফাতে পারে। বিশেষ করে শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের অভাব ঘটলে এটা বেশি হয়। চোখে অ্যালার্জি থেকেও চোখের পাতা নাচতে পারে। অ্যালার্জি হলে চোখ চুলকোয়। চুলকোনোর ফলে চোখের জলের সঙ্গে হিস্টামিন নির্গত হয় কিছুটা। এই হিস্টামিনকেও চোখের পাতা কাঁপার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অতিরিক্ত পরিমাণে কফি আর অ্যালকোহল পান করার জন্য চোখের গোলমাল দেখা দিতে পারে। মানে চোখের আশপাশের স্নায়ুতে। সেখান থেকে চোখের পাতা কাঁপার ব্যাপারটা আসতে পারে।

হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা : হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ, কারণ লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। ▯

মোক্ষ লাভে আর অধরা নয় পৌষ সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর মেলা

স্বপন দাস

বাংলায় একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল— সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার। এর পিছনে কারণ ছিল অনেক। নদীপথ ছিল ভয়ংকর। আর জল ও জঙ্গলে ভরা সাগরতটের কপিলমুনির আশ্রম ছিল জনমানবশূন্য। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার প্রথম গঙ্গাসাগর যাওয়া সেই আশির দশকের একেবারে গোড়ায়। সেই সময়ে গঙ্গাসাগরে যাবার আগে একটা ইনজেকশন নিতে হতো। সবাই বলতেন, এটা নাকি কলেরার ইনজেকশন। খুব ভয় হতো। এর আগে অবশ্য গিয়েছি অন্য ভাবে, লুকিয়ে। মেদিনীপুরের রসুলপুর হয়ে। গঙ্গাসাগরে পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যস্নান ছাড়াও, মাঘী পূর্ণিমা মেদিনীপুরের মানুষের কাছে আরেকটি পুণ্য দিন। দল বেঁধে এসে তারা আজও পুজো দেন কপিল আশ্রমে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই প্রথা চলে আসছে। যাইহোক, এই সময়ে মেলাও বসে এখনো। আর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে হয় শান্তি যজ্ঞ। আজও হাজারে হাজারে এই বাঙ্গালি পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন এখানে। তবে সেই মেলাটি গঙ্গাসাগরের মতো অত বড়ো না হলেও মানুষের মেলাটি কিন্তু খুব একটা ছোটো হয় না।

ফিরে আসি আগের কথায়। সেই ইনজেকশনের ভয় একটা মনের মধ্যে চেপে বসেছিল। কেননা মোটা সূচে গোরু-ছাগলকে দেওয়ার মতো প্রচলিত রীতিকে ভয় আকারে মনের মধ্যে বসিয়ে নিয়েছিলাম। অনেকে যখন বললেন যে একজন চিকিৎসক যদি একটা শংসাপত্র দিয়ে দেয়, তাহলে আর ইনজেকশন লাগবে না। আমিও সেই পন্থা নিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলাম ওই বিষয়টা। সেই সময় নামখানা আর চেমাগুড়ি ছিল সবচেয়ে প্রচলিত পথ। আর এই পথ খুব একটা সুগম ছিল না। বেশ কিছু নদীর সঙ্গমস্থল পড়ত এই পথে। আর শীতের সময় কুয়াশায় ঢাকা থাকত বিশাল জলরাশির পথ। দেখা যেত না পাড় সমেত কিছুই। নৌচালকদের অভিজ্ঞতায় ভর করেই এগিয়ে যেতে হতো। যেখানেই টালমাটাল অবস্থা হতো, দেখতাম অবাঙ্গালি সমেত বাঙ্গালিরাও গঙ্গামাকে অনেক কিছু নিবেদন করছেন। এই পথে ছিল জলের মধ্যে থাকা অনেক চোরা ঘূর্ণী। যেটা একেবারে মোচার খোলের মতো নৌকোকে টেনে নিত জলের তলায়। সেই সময়ে মা অভয়া লঞ্চডুবির ঘটনা তো আমরা অল্পবিস্তর সবাই জানি। এরপর আশির দশকের শেষভাগ থেকে চেষ্টা চলতে থাকে হারউড পয়েন্ট থেকে পারাপারটা মানে ওপারে সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়া হয়ে কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছানোর। এই রাস্তা ধরে ৩৩

কিলোমিটারের মতো পথ পেরোতে হয়। আর জলপথ অনেকটাই নিরাপদ। মুড়ি গঙ্গার একধার পেরিয়ে কচুবেড়িয়া পৌঁছানো। গঙ্গার মূল ধারাটা অবশ্য অন্য ধার দিয়ে চলে গেছে। যারা পর্যটন বিলাসী তাঁদের জন্য এখানে রয়েছে লাইট হাউস, মায়া গোয়ালিনীর ঘাট, আর রয়েছে একটি খাল, যেটা কেটেছিলেন রাজাদের লালসার শিকার হয়ে দ্বীপে বন্দি থাকা সুন্দরী বিধবারা।

একটু দেখে নেওয়া যাক, গঙ্গাসাগর মেলার এদিক ওদিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একেবারে শেষ প্রান্তে ছোটো-বড়ো ৫১টি দ্বীপ নিয়ে ৫৮০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে সাগরদ্বীপ। আর এই দ্বীপের আরেক নাম গঙ্গাসাগর। তার কারণ এখানেই গঙ্গার সঙ্গে মিলন ঘটেছে সাগরের। গঙ্গার মর্ত্যে আসা ও সগর রাজার পুত্রদের জীবনদানের লোকগাথাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে গঙ্গাসাগর তীর্থভূমি।

কপিলমুনির আশ্রমটি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা কপিল মুনির মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে চলে আসছে মেলা। এই মেলাকে কেন্দ্র করে ভক্ত সমাগম হয়। রামায়ণ, মহাভারত থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সর্বত্রই স্থান করে নিয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। বহু পুরাণেও গঙ্গাসাগরের উল্লেখ আছে। কুম্ভমেলা সে হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী যেখানেই হোক, সেসব মূল ভূখণ্ডে। সবই অন্তত এক মাস ধরে। গঙ্গাসাগর মূল ভূখণ্ডের বাইরে এক দ্বীপ। এক দিকে ভাগীরথী, অন্য দিকে মুড়িগঙ্গা, আর এক দিকে বড়তলা নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভারতবর্ষে জলবেষ্টিত দ্বীপে একটিই সর্বভারতীয় ধর্মীয় মেলা হয়, তার নাম গঙ্গাসাগর মেলা।

নদীর ভাঙনে এখানকার বহু দ্বীপ তলিয়ে গেছে। ভাঙন এই দ্বীপের একটি বড়ো সমস্যা। এখনকার আর একটা বড়ো সমস্যা হচ্ছে, নদীতে চর। আগে মুড়িগঙ্গায় লোহাচরা নামে একটা দ্বীপ ছিল এখন সেটি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ভাঙন ঘোড়ামারা দ্বীপকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে। যদি গঙ্গাসাগরের দিকে তাকানো যায় তাহলে

দেখা যাবে গঙ্গাসাগর দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে ত্রিশ মাইল থেকে কমতে কমতে এখন মাত্র ১৯ মাইলে এসে ঠেকেছে।

১৮৩৭-এর ৪ ফেব্রুয়ারি সমাচার দর্পণ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে আমরা জানতে পারছি, 'ভারতবর্ষের অতি দূর দেশ অর্থাৎ লাহোর, দিল্লি ও বোম্বাই হইতে যে বহুতর যাত্রী সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের ন্যূন নহে...। বাণিজ্যকারী সওদাগর ও ক্ষুদ্র দোকানদারেরা যে ভুরি ভুরি বিক্রয়দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল, তাহা লক্ষ টাকারও অধিক হইবে।' ফলে সাগরতটের এই মেলা উনিশ শতকেও একটা আন্তর্জাতিক চরিত্রের ছিল। সমাচার দর্পণ মারফত আরও জানতে পারছি সে সময়ের সংবাদ প্রতিবেদনে, 'ব্রহ্মদেশ হইতে অধিকতর লোক আসিয়াছিল।' ফলে দেশীয় মানুষের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাইরের মানুষের কাছেও বেশ পরিচিত এই গঙ্গাসাগর মেলা।

এক সময়ে এই দ্বীপের নাম ছিল পত্তাল। যা আমরা বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিতে পাতাল হিসেবেই পেয়ে থাকি বলে মনে করেন গবেষকরা। জনমানবহীন দ্বীপে বসতি স্থাপনের সর্বপ্রথম উদ্যোগ ওয়ারেন হেস্টিংসের। জঙ্গল কেটে লোক বসানোর জন্য ১৭১৮-তে ৩০ হাজার টাকা অনুমোদন করেন তিনি। বাঙ্গালিরা গেল না, আরাকান থেকে পাঁচশো পরিবার বসতি গড়ল সেখানে। ১৮২২-এ দ্বীপে তৈরি হলো রাস্তা। ১৮৩১-এ বসল টেলিগ্রাফের তার। আজকের, মানে বর্তমানের গঙ্গাসাগরের রূপদাতা কপিল মুনি নন, ওয়ারেন হেস্টিংসই সাগরতীর্থের মূল কারিগর।

সে যাক, ফিরে দেখা যাক পুরাণের সেই কাহিনিকে। যে কাহিনিকে মেনে লাখো পুণ্যাতুর মানুষ পাগলের মতো ছুটে আসেন এই গঙ্গাসাগরতটে। সাগরমেলা চেহারা নেয় এক মিনি ভারতের। নানা রঙের, নানা বর্ণে এক অখণ্ড ভারতের ছবি আঁকা হয় এই সাগরতটের ক্যানভাসে।

কিংবদন্তীর সেই কাহিনি একবার দেখা যাক। এই গঙ্গাসাগরে সাংখ্যদর্শনের আদি প্রবক্তা কপিলমুনির আশ্রম ছিল। সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়াকে কেন্দ্র করে সাধনারত কপিল মুনিকে বিব্রত করেন সগর রাজার সন্তানেরা। অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে

রেখেছেন কপিল মুনি, এই ভেবে তাঁরা কপিল মুনিকে আক্রমণে উদ্ধত হন। সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে মুনির। কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হন এবং তাদের আত্মা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সগরের পৌত্র ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এসে সগরপুত্রদের পাপ ধুয়ে ফেলেন এবং তাদের আত্মা মুক্ত করে দেন (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪৩ অধ্যায়)। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অংশে গঙ্গাসাগর তীর্থের কথা বলা হয়েছে।

পালবংশের রাজা দেবপালের একটি লিপিতে তাঁর গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্মানুষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছে। লোক কাহিনি অনুযায়ী এখানে কপিল মুনির একটি আশ্রম ছিল।

অনেকে ভাবেন এই সাগরতটে সারাজীবনের পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই তাঁরা গোরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হন এখানেই। আর একদল ভাবেন মাহেন্দ্রক্ষণের পুণ্য লগ্নে (পৌষ সংক্রান্তিতে) সাগরে মকরস্নানে মুক্তি ঘটবে তাঁদের। পাপ ধুয়ে যাবে সব।

সন্তান লাভের আশায় একদল ছুটে আসেন আজও। নব দম্পতি মোক্ষ স্নানের পর আগুনের তাপে নিজেদের সেকে নেয়। গঙ্গা মা, কপিল মুনি আর ভগীরথকে পূজা অর্পণে সিদ্ধিলাভের আশায় পুজো দেন। এখানেই অনেকে তাঁদের প্রথম সন্তান গঙ্গাকে উৎসর্গ করার মানত করেন। আর প্রথম সন্তানকে কোনো না কোনো সময়ে, সে যে বয়েসেরই হোক না কেন, ছয় মাস থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে— এনে স্নানের মাধ্যমে উৎসর্গ করেন সন্তানকে।

অনেকে আবার তাঁদের স্বর্গীয় পূর্বপুরুষদের পাপ মুক্তির বা শাপ মুক্তি, যাই বলা হোক না কেন, সেই উপলক্ষ্যে আদ্যশ্রাদ্ধের কাজটি এখানেই করেন। তাঁরা মনে করে সগর রাজার সহস্র পুত্রের শাপমুক্তি যে ভাবে তাঁর উত্তরপুরুষরা করেছিলেন, সেভাবেই মুক্তি দিচ্ছেন তাঁরা।

নাগা সন্ন্যাসী সমেত বহু সন্ন্যাসীরাও আসেন। যেমন ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁরা কুম্ভ মেলায় ছুটে যান। আর গঙ্গা আর সাগরের সঙ্গম স্থলে এসে তারাও মোক্ষ লাভের আশা করেন।

এত গেল পুণ্যাতুর মানুষের কথা। সঙ্গে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, যারা সবাই পর্যটক, তাঁরা এখানে এখন ছুটে আসেন— পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ আঞ্চলিক মেলাকে সামনে থেকে উপভোগ করবেন বলে। তাঁরা এখানকার নানা আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বাদ যেমন পান। দেখতে পান সারা ভারতের সব রাজ্যের মানুষদের, তাঁদের নিজের নিজের পোশাকে। আর মিশে যেতে পারেন সেইসব মানুষদের সংস্কৃতির মধ্যে।

দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে এই গঙ্গাসাগরকে নিয়ে জানুয়ারি মাসটা পড়লেই ভাবতে শুরু করি। কেন জানেন, একটি মিনি ভারতকে দেখার সুযোগ মেলে এখানে। নানা রং, নানা ভাষা, নানা পোশাক, নানা রীতি সব মিলিয়ে এক অনন্য ক্যানভাস। যা তুলি দিয়ে সৃষ্টি করা যায় না। যা সৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরের মানসচক্ষু দিয়ে, প্রকৃতির ক্যানভাসে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। এই গঙ্গাসাগর মেলা সেই অর্থে সারা ভারতের ঐক্যের একটি প্রতিচ্ছবি।

কীভাবে যাবেন গঙ্গাসাগর :

আগে শুধুমাত্র এই মুড়িগঙ্গায় নৌকাই ছিল একমাত্র পথ। এখন ভেসেল চলে হারউড পয়েন্ট হয়ে। আপনি সকালে গিয়ে, বিকেলেই কলকাতায় ফিরতে পারেন, যদি গাড়ি নিয়ে যান। এবছর নামখানা-চেমাগুড়ির রাস্তাকে আবার চালু করার ভাবনা চিন্তা চলছে।

গঙ্গাসাগরের নিকটতম বড়ো শহর কলকাতা। আর রেলস্টেশন কাকদ্বীপ ও নামখানা। কলকাতা থেকে বাসে ঘণ্টা তিনেকের যাত্রায় পৌঁছানো যায় হারউড পয়েন্ট ৮ নম্বর লঞ্চ ঘাটে। সেখান থেকে ফেরি ভেসেলে গঙ্গা পেরিয়ে কচুবেড়িয়া। কচুবেড়িয়া থেকে বাসে বা ট্রেকারে ৩০ কিলোমিটার দূরে সাগর।

যারা হাওড়া হয়ে আসবেন : মেলার সময়ে হাওড়া স্টেশন থেকেও লট ৮ পর্যন্ত বাসের বন্দোবস্ত থাকে। তবে অন্য সময়ে যদি আসতে চান, তাহলে হাওড়ায় ট্রেন থেকে নেমে ধর্মতলায় এসে কাকদ্বীপ বা নামখানার বাসে নতুন রাস্তার মোড়ে নেমে ভ্যান রিকশা অথবা অটো বা বাসেও চলে যাওয়া যাবে লট-৮। মেলার সময় যাতায়াতের আরও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। গঙ্গাসাগরে থাকার জন্য নানান ধর্মশালা ও পান্থনিবাস আছে।

এছাড়া পি.ডব্লু.ডি., সেচ দপ্তর ও পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিঙের বাংলো ও পঞ্চায়েতের যাত্রীনিবাস আছে। এখন আধুনিক আলোকসজ্জায় আলোকিত সাগরতট। আগে শুধুমাত্র রাত্রে জেনারেটরে আলো জ্বলতো। এখন দ্বীপে সরাসরি বিদ্যুৎ চলে গেছে। ফলে বিদ্যুৎ সারাদিন। আর আছে খাবারের সব রকম ব্যবস্থা। এখানে বহু মিশনের আশ্রম আছে। গঙ্গাসাগর মেলায় থাকার জন্য কম করে দু'তিন মাস আগে থেকে ঘর বুক করতে হয়।

সবশেষে বলি, পুরোন সেই দিনের কথা ভুলে যান। এখন আর গঙ্গাসাগর একবার নয়, বার বার। মানুষের উইক এন্ড পর্যটন মানচিত্রে একটা প্রধান জায়গা করে নিয়েছে সাগরদ্বীপ। আর এই সময়ে নলেন গুড় আর পাটালির অমোঘ টান উপরি পাওনা। ■

শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার বিবর্তন

হীরক কর

মাত্র দেড় বছর বয়সে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই সূত্রেই প্রতিমা দেবীর কোলে ওঠা। তার পরের বছর ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি প্রতিমা দেবী প্রয়াত হন। কিন্তু তার কয়েকমাস আগে একটি শিশুর কানে যে আদর্শের আশীর্বাদ গেঁথে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, তাই পরবর্তীকালে সার্থক হয়ে উঠবে তা কেউই বুঝে উঠতে পারেননি।

বোঝা গিয়েছিল তার প্রায় বাইশ বছর পরে। ১৯৯২ সালে দোলের আগের এক সন্ধ্যায় অরিন্দম চক্রবর্তী অর্থাৎ নীলদার হাত ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সাংবাদিকতার আমাদের প্রায় ৮ জনের শান্তিনিকেতনে যাওয়া এবং শ্রীনিকেতনের এক কাকুর কোয়ার্টারে ওঠা। তখন এত পাঁচিল আর ভেপারে লজ্জিত ছিল না শান্তিনিকেতন। দোল পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আক্ষরিক অর্থেই স্পষ্ট। সে রাতে 'ও আমার চাঁদের আলো'অথবা 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গাইতে গাইতে পায়ে হেঁটে গৌড় প্রাঙ্গণ থেকে শ্রীনকেতনে ফেরা। যা এখনো স্মৃতিতে 'চাঁদনি' ছড়িয়ে দেয়।

পরের বছর ১৯৮৩-তে আমার আর অংশু চক্রবর্তীর একটি দু'কামরার আস্তানা হলো দিগন্তপল্লীতে। সে বাড়িতে দোলের সময় সহপাঠীদের চাঁদের হাট বসত। আর পৌষ মেলার সময় সে বাড়ি গিয়ে উঠতাম আমি আর স্মরজিত রায়চৌধুরী। তখন প্রত্যেক সপ্তাহান্তে আমার গুরুদেবের আশ্রমে যাওয়া। উদয়ন বাড়ির একতলার ডানদিকে অধুনা বন্ধ ছোট্ট ঘরটিতে বসতেন উত্তরায়ণের সুপারিটেনডেন্ট দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ আলুদা। সেখানে সকালে বিকালে কাজের ফাঁকে ছিল আমাদের আড্ডা। সেই আড্ডায় আসতেন সাগরময় ঘোষ, শান্তিদেব ঘোষের মেজ ভাই মন্টুদা। নীলিমা সেন অর্থাৎ বাচ্চুদির মেয়ে চুয়াদি, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অরূপ সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, শান্তিনিকেতনের দুই ট্রাস্টি পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (লেবুদা), সুপ্রিয় ঠাকুর, বিশ্বভারতী লাইব্রেরিয়ান স্বপন কুমার ঘোষ। পৌষ মেলার সময় সেই আড্ডাই চলে যেত পূর্বপল্লী স্থিত মেলার মাঠে কালোর দোকানে। সেখানেই আমার সঙ্গে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ মোহরদির পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ। যারা ছিল প্রায় আমাদের সমবয়সি। মেলার সময় সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতো সাত সকালে ৭ই পৌষের ছাতিমতলা আর পঁচিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মোমবাতির আলোয় স্নিগ্ধ কাঁচমন্দির। সারারাত্রি বাউল ফকিরের এক আখড়ায় শুধু গান আর গান। রবীন্দ্রনাথ আর লালন। টানা তিনদিন রাতে পড়ে থাকতাম বাউল ফকিরের এক আখড়াতেই। এখানেই প্রথম আলাপ অসমের বাসুদেব বাউল, গুসকরার কার্তিকদা, বোলপুরের লক্ষণদা, জাপানি বাউল কাজুমী, পার্বতী বাউলের সঙ্গে। আমরা হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে উঠলে গুসকরা থেকে ট্রেনে উঠে পড়ত কার্তিকদা। আখড়া থেকে দুপুরে চলে আসতো আমাদের আস্তানায়। এমনিতেও সাধারণ দিনে বাড়ি ভরে উঠত কার্তিকদা বা আমাদের শান্তিনিকেতন পরিবারের ভোলানাথ ঘড়ুইয়ের বাউল গানে। সারারাত কেটে যেত গীতবিতান খুলে অসিত বিশ্বাসের কণ্ঠে জর্জদার গাওয়া রবীন্দ্রনাথে।

এরপর আমরা আরও জড়িয়ে যাই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে। মূলত, আমাদের উদ্যোগেই বিশ্বভারতীতে গড়ে ওঠে পর্যটন এবং সাংবাদিকতা

বিভাগ। সে এক কাহিনি। পর্যটন বিভাগের শুরুতে অনেক বিদগ্ধদের সঙ্গে কমিটি মেম্বার হয় অসিত বিশ্বাস। এই অর্বাচীন কলমচিকে রাখা হয় সাংবাদিকতা বিভাগের সূচনা কমিটিতে। ফলে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী হয়ে ওঠে আমাদের আরেকটি আবেগের জায়গা। ছাতিমতলার সেই বাণীটি, 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'—এখনও হৃদয়ে উজ্জ্বল।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে বোলপুর শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যা কালক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এরপর ১৯২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। যা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন।

১৮৪৩ সাল ২১ ডিসেম্বর। বাংলা ক্যালেন্ডারে দিনটা ছিল ১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ। কুড়ি

জন অনুগামীকে নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার সময় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছ থেকে ব্রহ্মের নামে অঙ্গীকার করে দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। কার্যত এই দিনটিকে বলা যেতে পারে ব্রাহ্মধর্মের সূচনার দিন। দেবেন্দ্রনাথ 'মহর্ষি উপাধি' পান ১৮৬৭ সালে।

১৮৮৮ সালের ৮ মার্চ ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গুন শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্য প্রণীত 'ট্রাস্ট ডিড' করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। সেখানে একটি মেলা বসাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, 'মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ ও বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি এই মেলা থেকে কোনোরূপ আয় হয় তবে ট্রাস্টিদের আয়ের টাকা মেলার কিংবা আশ্রমের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিবেন'।

১৮৯৪ সালে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মন্দিরের উলটোদিকে উদয়ন বাড়ির সামনের মাঠে ৭ই পৌষ ছোটো করে শুরু হয় 'পৌষমেলা'।

মহর্ষি যদিও নিজে কখনো শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় যোগ দেননি। এখানে ৭ই পৌষের কয়েকটি তাৎপর্য আছে। প্রথমত, এটি মহর্ষি দীক্ষা দিবসের সাংবাৎসরিক উৎসব। দ্বিতীয়ত, ১৮৯১ সালের ৭ই পৌষ, মন্দির উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময় মেলা বসতো মন্দিরের উত্তর দিকের মাঠে। যাকে এখনো 'পুরনো মেলার মাঠ' বা 'জগদীশ কানন' বলা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, ১৯০১ সালের ৭ই পৌষ, শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন

রবীন্দ্রনাথ, যা 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। সেই বছর 'পৌষ মেলা' সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লেখে, 'খুব জনতা। বেশ ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। বাউল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে নৃত্যগীত পরিবেশন করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের জোয়ার'।

১৯১০ সালে অমর্ত্য সেনের পিতৃদেব পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা একটি চিঠিতে গুরুদেব আশ্রমের মন্দিরে বুদ্ধ, খ্রিস্ট, মহম্মদ, চৈতন্যদেব প্রমুখ মহামানবের স্মরণ উৎসব পালনের নির্দেশ দেন। সে বছর ২৫ ডিসেম্বর নিজস্ব ধারায় শান্তিনিকেতনে প্রথম পালিত হয় 'খ্রিস্টউৎসব'। 'ভারততীর্থ, গান-কবিতাটিও

লেখা হয় এই সময়েই। শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসব ও মেলার বিবর্তন বোঝার জন্য কবির ভাবাদর্শগত অভিমুখ তথা শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ইতিহাসকে সমান্তরাল রাখা প্রয়োজন। গীতাঞ্জলি-গোরার পর্বে শান্তিনিকেতন মন্দিরের একান্ত ব্রাহ্মীয় চরিত্রটিও যে অনেকটা বদলে গিয়েছিল, তা গুরুদেবের 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালা পড়লেও বোঝা যায়।

১৯১৯ সালের পৌষমেলায় বাউলদের রাখার কথা উল্লেখ আছে। ওই বছরই 'বিশ্বভারতী সংসদ' গঠিত হয়। এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন না হলেও বিশ্বভারতীর কাজকর্ম ওই সময় থেকেই শুরু হয়। প্রায় বছর তিনেক বাদে ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীনিকেতন'। ১৯২৪ সালে মেলাকে আলোকিত করার জন্য প্রথম জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়। ওই জেনারেটরটি ছিল গুরুদেবের পতিসরের জমিদারি সম্পত্তি। ১৯১৮ সালে আশ্রম আলোকিত করার জন্য এটি সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়।

চতুর্থত, ১৯২১-এর ৭ই পৌষ, আম্রকুঞ্জে দাঁড়িয়ে দীক্ষান্ত ভাষণে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'কে বিশ্বের হাতে তুলে দেন রবীন্দ্রনাথ। এবং এই আশ্রমের নাম দেন 'বিশ্বভারতী'। গুরুদেবের ওইদিনের ভাষণ পড়লে জানা যায় বিশ্বের সার্বজনীন সমস্ত মানুষ বিশ্বভারতীতে অংশ নিতে পারবে। চীনা ভবন, নিপ্পন ভবন, আজকের বাংলাদেশ ভবনের প্রতিষ্ঠা এই ভাবনা থেকেই।

মহর্ষির দীক্ষার সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতার প্রতি আশ্রমিকদের এক রকম তর্পণ বলেই তা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে ৭ই পৌষ একটা তারিখমাত্র ছিল না। এ ছিল তাঁর কাছে একটা আদর্শ, একটা সময়প্রতীক।

পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরুতেই ৭ই পৌষের মন্দিরের উপাসনা স্থান বদল করে মন্দির থেকে চলে যায় ছাতিমতলায়। আগে সন্ধ্যায় এবং সকালে উপাসনা হতো। কিন্তু এই সময় থেকে ছাতিমতলায় উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে শুধু সকালে। ৭ই পৌষ ছাতিমতলা উপাসনা রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেখে যেতে পারেননি। নানা কারণে ১৯০৭, ১৯১১, ১৯১২, ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২৪ রবীন্দ্রনাথ নিজে পৌষ মেলায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু যেখানেই থাকুন শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত থাকলে গুরুদেবের মন পড়ে থাকত আশ্রমের মেলার মাঠেই।

এরপর মেলা জনপ্রিয়তা পেলে জায়গার অভাব দেখা দেয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষের বছরে মেলা উঠে আসে পূর্বপল্লী এখনকার মেলার মাঠে। ১৮৯৪ সালের আগে থেকেই 'বাজি প্রদর্শনী', ছিল মেলার অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু এই বাজি প্রদর্শনী দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ প্রথমে পরিবেশ আদালতের রায়ে শব্দহীন হয়। ২০১৭ সালে তা পুরোপুরি ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

মেলার শুরু হয় সানাইয়ের সুরে। খুব ভোরে শান্তিনিকেতন বাড়ি থেকে ভেসে আসে সানাইয়ের সুর। তারপরেই আশ্রম পরিক্রমা বৈতালিকের গানে। তেমনই এই সময় শীতের ছুটির দিনগুলোয় শান্তিনিকেতন ঘিরে ছড়িয়ে থাকে বাউল ফকিরের সুর। মুখোশনৃত্য, রণ-পা, ছৌ-নাচ বাদ যায় না কিছুই। 'দাশু রায়ের পাঁচালী', 'মালদার গম্ভীরা', মুর্শিদাবাদের 'আলকা", ছোটো ছোটো নাট্য দলের যাত্রা সবই দেখেছি এই মেলার মাঠে। ৯০ দশকে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য শান্তিদেব ঘোষ অশতীপর বয়সেও মেলার মঞ্চের পাশে ঠায় বসে থেকে মঞ্চ সঞ্চালনা করতেন। প্রত্যেকটি গ্রামীণ শিল্পীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। নিজেই ডেকে নিতেন মঞ্চে।

কালের বিবর্তনে সেদিনের গ্রাম্য পৌষ মেলা আজ পরিণত হয়েছে শহুরে বাণিজ্য উৎসবে। প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মন্দিরের উলটোদিকের মাঠে ৭ই পৌষ ছোটো করে শুরু হয় পৌষমেলা। এরপর কালের নিয়মে সেদিনের গ্রাম্য পৌষ মেলা আজ পরিণত হয়েছে শহুরে বাণিজ্য উৎসবে। কাঁথাস্টিচ, চামড়া বা বাটিকের মতো পণ্য সাজিয়ে ছোটো ছোটো হস্তশিল্পীরা স্টল সাজিয়ে বসেন বটে, কিন্তু তাঁদের জায়গা দেওয়া হয় মেলার এক ধারে। আবাসন কোম্পানিগুলি স্টল সাজিয়ে গুছিয়ে মেলা চত্বরের অনেকটা দখল করে বসে। সঙ্গে থাকে দামি গাড়ির শোরুম। তাই, একদিকে যেমন 'গ্রাম্য মেলা', তেমনি অন্যদিকে মেলা যেন হয়ে উঠেছে 'কর্পোরেট'।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এই মেলা শুরু করেন, তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসব পালন। কিন্তু ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের অর্থনীতিকে সারিয়ে তোলার লক্ষ্যেই জোর দিয়েছিলেন

মেলায়। স্বদেশি আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েই স্থানীয় পণ্যের বিক্রির কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তৈরি করেছিলেন 'স্বদেশি সমাজের সংবিধান'।

একথা ঠিক যে মহর্ষি তাঁর ১৮৮৮ সালের ৮ মার্চের 'ডিড'-এ শান্তিনিকেতনে একটি বাৎসরিক মেলা করার জন্য ট্রাস্টির সদস্যদের 'চেষ্টা ও উদ্যোগ' করতে বলেছিলেন। এই দলিল যখন রচিত হয় তখন বিশ্বভারতী দূরের কথা, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আজও কাগজে-কলমে এই মেলা পরিচালনার অধিকারী মহর্ষি-প্রবর্তিত সেই শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। উৎসব ও মেলা শুরু হয় প্রতি বছর ৭ই পৌষ; চলে তিন দিন ধরে। তবে, ভাঙা মেলার বিস্তার ছিল প্রায় এক মাস।

বাঙ্গালির তেরো পার্বণের বাইরে অন্যতম আরেকটি উৎসব হলো পৌষমেলা। প্রতি বছরই শীতকালে ভিড় জমান হাজার হাজার বাঙ্গালি। বোলপুরের লালমাটির টানে ছুটে আসেন বিদেশি পর্যকরাও। কিন্তু এবছর বন্ধ থেকেছে সেই উৎসবের আমেজই। শীতের মরসুমেও করোনা আবহে ধু-ধু করছিল পরিচিত পূর্বপল্লীর মাঠ। সেই বিবর্তনের পর থেকেই পৌষমেলার ওপরে আজও যে অনেকে আর্থিকভাবে নির্ভরশীল তা না বললেও চলে। বছরের এই সময়টার ওপরেই জীবিকা নির্ভর করে অসংখ্য মানুষের। মেলা বন্ধ হওয়ায় সংকটের মুখোমুখি তাঁরা। তাই প্রাক্তনী এবং আশ্রমিকরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও ক্ষুব্ধ এলাকার ব্যবসায়ী সমিতি। অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছেন এ বিষয়ে। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালে বন্ধ ছিল পৌষমেলা। কারণ ছিল মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কিন্তু তারপর কোনোদিনও থেমে যায়নি এই উৎসবের রেশ। ৭৪ বছর পর গত বছর ছেদ পড়ছে সেই ঐতিহ্যবাহী ধারায়। অন্যদিকে এবছরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বাতিল হয়েছিল দোল উৎসবও। মহামারীর কারণে আগামী বছরের দোল উৎসবও যে বন্ধ থাকবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

২০২০-র মতো মহামারীর কারণে বন্ধ ছিল বিশ্বভারতীর এবছরের পৌষমেলা। তবে মেলা বন্ধ থাকলেও উৎসব পালনে ত্রুটি থাকেনি কোনো। এ বছর 'পৌষ উৎসব' করেছে বিশ্বভারতী। অন্যদিকে বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে বোলপুর ডাকবাংলা মাঠে একটি বিকল্প পৌষ মেলা হয়েছে। ডাকবাংলা মাঠে গড়ে ওঠে বাউল মঞ্চ। বসে নাগরদোলা। এমনকী বৈতালিক এবং খ্রিস্ট উৎসবের মতো বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান পালিত হয় এখানে।

পাশাপাশি এই মেলা সামাজিক মেলবন্ধনের চিহ্নও। যেখানে ব্রহ্মচর্চায় বৈদিক পাঠের সমান্তরালে পালিত হয় যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে একটি সময়সূচি প্রকাশ করা হয়। সেই অনুযায়ী ৭ই পৌষ থেকেই রীতি মেনে চলে উপাসনা, মহর্ষি স্মারক বক্তৃতা। পালিত হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও খ্রিস্টোৎসবও। যা দেখে বোঝা যায়, কবির দৃষ্টি কখনও বিশেষ ধর্মবুদ্ধি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর সীমায়িত হয়ে নেই। পৃথিবীতে আর কোথাও খ্রিস্টোৎসবে বৈদিকমন্ত্র, উপনিষদ আর বাইবেল একযোগে পাঠ হয় কি না জানা নেই। জানা নেই, এমন একটা অসাধারণ বড়দিন পালনের কথাও। আজও গুরুদেবের আশ্রমে থাকলে ছুটে যাই পঁচিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মন্দিরের সামনে। সমস্ত আশ্রমিক, আশ্রম বন্ধুদের সঙ্গে দক্ষিণায়ণের রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়াই। ছুঁয়ে যান রবীন্দ্রনাথ। মোমবাতির আলোয় উদ্ভাসিত মন্দির শিহরণ জাগায়। ভেসে আসে সমবেত কণ্ঠ, 'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে রাজারও দোহাই দিয়ে'। □

আড্ডার বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

অনুপ দাশ ড্যান্স অ্যাকাডেমি (আড্ডা)-র আয়োজনে গত ২৪ ডিসেম্বর নিউইয়র্কস্থিত ব্রঙ্কসের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ বিজয়ের ৫০ বছর সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত দিয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা অনুষ্ঠানের সূচনা করে। জাতীয় সংগীতের পরেই সঞ্চালক পল্লব সরকার পরিচয় করিয়ে দেন সম্মানিত অতিথিদের। একে একে তাঁদের মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় এবং উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাবাজার বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং 'হৃদয়ে বাংলাদেশ'-এর সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন, ফোটো সাংবাদিন এবিএম তুষার, সংগঠক মিয়া মুহাম্মদ দাউদ, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রফ, মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমেদ।

মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমেদ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেন। সভাপতি আল্পনা গুহ বলেন আড্ডার উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রাখা এবং নিজের শিকড়ের সন্ধান দেওয়া। আল্পনা গুহ সকলকে আড্ডার পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান।

এরপর দর্শকরা উপভোগ করেন আড্ডার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে ছিল কবিতা, নাচ, গান। নাচে অংশ নিয়েছে ইশা, কৃষ্ণা, তিশা, রিয়া, তুলসী, অদিতি, চৈতন্য পারমিতা, ত্রিপর্ণা, সংহিতা, রুচি, সৃষ্টি, অমৃতা, আদ্রিকা। কবিতায় ছিলেন সুনিত্রা সেন, রিয়া, পারমিতা, সংহিতা, অমৃতা, সৃষ্টি, অদ্রিকা। গানে ছিলেন মুসলে টিটু, হৈমন্তী দেবনাথ, রিয়া, তুলসী। নাচের কোরিওগ্রাফ করেছেন প্রয়াত নৃত্যগুরু অনুপ কুমার দাশ ও আড্ডার বর্তমান নৃত্যের শিক্ষিকা মিথান দেব। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন পল্লব সরকার ও সুরাইয়া লাকী। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আল্পনা গুহ, পল্লব সরকার, মিথান দেব, মৃদুলা আলম, ইশানী চৌধুরী, নিরমা গোলদার।

ত্রিপুরায় স্বস্তিকার পাঠক সমীক্ষা বৈঠক

গত ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরা প্রদেশে এই প্রথম সাপ্তাহিক স্বস্তিকার সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা এবং প্রকাশক সারদা প্রসাদ পালের উপস্থিতিতে বিভাগ অনুসারে পাঠক সমীক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা বিভাগের বৈঠক আগরতলাস্থিত সঙ্ঘ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগ কার্যবাহ দেবাশিস চক্রবর্তী এবং প্রান্ত প্রচার প্রমুখ তাপস রায় এই বৈঠকে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর ত্রিপুরা বিভাগের বৈঠক ধলাই জেলার উলুবাড়ি লেট উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুকোমল কান্তি দাস বৈঠকে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা বিভাগে দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি শান্তির বাজারে এবং দ্বিতীয়টি উদয়পুর নগরে।

সব বৈঠকে উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় তথা স্বস্তিকার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সবার মতামত নেওয়া হয়। এই কার্যক্রমকে সর্বতোভাবে সফল করবার জন্য সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কানুলাল মালাকারের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

নাথ দর্শন ও শৈব সাধন রীতি

মহন্ত যোগী সুন্দরনাথ মহারাজ

নাথ শৈব দর্শনে গুরুর সম্ভূতি বা স্তর অনুযায়ী তিনটি স্তরে গুরুর ভূমিকার মান্যতা দেওয়া হয়। (১) আদিনাথ শঙ্কর, ৫২ ভৈরব, ৬৪ যোগিনী ও নবনাথ এই নিয়ে দিব্যৌঘ গুরু বা দিব্য গুরু। (২) চুরাশি সিদ্ধাইকে নিয়ে সিদ্ধৌঘ বা সিদ্ধগুরু। (৩) তৎপরবর্তী সবাই মানবৌঘ বা মানব গুরু।

এর পাশাপাশি, নাথ গুরু পরম্পরায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আছে, যা শুধুমাত্র বৈদিক শাস্ত্র নয় প্রচলিত সবকটি গুরুবাদী দর্শনের থেকে এক স্বতন্ত্র করেছে। অন্যান্য দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের সময়কালকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে নাথ দর্শন সত্য যুগের আগে অব্যক্ত 'অনাদি যুগ'-কে মান্যতা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ নাথ দর্শনে ৫টি যুগ এবং এই পাঁচটি যুগের তারা বন্দনা করে থাকেন নাথ আচার্যরা। যদিও ঋকবেদের 'নাসাদীয় সূত্রে' ও 'হিরণ্যগর্ভ সূত্রে' এবং পরবর্তী সময়ে বেদান্তে (কঠ উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বে) এই পঞ্চম যুগটির সামান্য আভাস দেওয়া আছে মাত্র।

নাথ দর্শনে মনে করা হয় যে, ৫টি যুগে আলাদা আলাদা নাথ গুরু বা আচার্য এই জগতের পরমপুরুষ পরমেশ্বর রূপে 'অব্যক্ত-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়' এই চারটি বিষয় প্রবর্তন, পরিচালনা ও পরিণাম ভাবনা করেন।

অনাদি যুগের তিন নাথ আচার্য।

(১) অলখ নাথজী বা নিরঞ্জন। অঞ্জন মানে রং বা মনের ভাব। মন, দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্রা (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) ভোগের বাসনায় দশ দিকে ধাবিত হয় এবং হাস্য, করুণ, রুদ্র, বীর, শৃঙ্গার ইত্যাদি নানান রসে রঞ্জিত হয়। নিরঞ্জন মানে যিনি বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডের কোনো রং বা ভাবের দ্বারা আবদ্ধ নন। চির মুক্ত পুরুষোত্তম। অলখ পুরুষ মানে যিনি সবখানে, সর্বভূতে, সবসময় বিরাজমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচরে বা অলক্ষে থাকেন, শুধুমাত্র বোধে বোধ হন।

(২) অনাহত বা অনহদ্ নাথজী। ব্রহ্মাণ্ডে স্পন্দনরূপী প্রথম প্রকাশ। অর্থাৎ অলখ নাথজী বা নিরঞ্জন পুরুষের ঈক্ষণে বা আদেশে হিরণ্যগর্ভ থেকে ব্রহ্মাণ্ড হয়ে জগৎ সৃষ্টি ও প্রসারিত হলো। এই প্রসারণে মহানাদ বা স্পন্দন সৃষ্টি হলো যা দুটি বস্তুর পরস্পরের মধ্যে বিনা আঘাতে সৃষ্ট বা অনাহত (যে কোনো তরঙ্গ, স্পন্দন, শব্দ, পরস্পর দুটি বস্তুর মধ্যে আঘাত বা আহত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়) নাদ। এই অনাহত নাদ স্পন্দনই জগৎ সৃষ্টির আদি ও মূলভূত কারণ।

(৩) মহা মনসানাথজী। মনঃজাত বা মনঃসৃজিত ইতি মনসা। যিনি শুধুমাত্র মনন বা সৃজন করার নিমিত্তে আদেশ বা ঈক্ষণ করেন। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'বিশ্বচৈতন্য' বা 'Universal Consciousness'।

মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু এই চৈতন্যের প্রভাবে একটা মহাজাগতিক অনুশাসন ও নিয়মে পরিচালিত হয়। এই চৈতন্যকে অবস্থা ভেদে চার পর্যায়ে ভাগ করা হয়। জাগ্রত, সুষুপ্তি, অচেতন, অতিচেতন যাকে শৈবাগমে মোহ-মায়া, মহামায়া, যোগমায়া ও মায়াতীত বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই মোহ-মায়া, মহামায়া ও যোগমায়ার জগতে সমস্ত জীব পাঁচটি স্তরের মধ্যে তাদের চেতন বা চিত্তভূমিকে সীমাবদ্ধ রাখে। চিত্তভূমি বা চিত্তের স্বাভাবিক এই পাঁচ অবস্থা হলো— (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরুদ্ধ।

এর পরে মায়াতীত অবস্থা, তুরীয় ও তুরাতীত যা সনাতনী অধ্যাত্ম শাস্ত্রে স্ববিকল্প ও নির্বিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধী নামে পরিচিত। সর্বশেষের এই তুরাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হলে জীবন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ আর তার পুনর্জন্ম হয় না। একেই বলা হয়েছে মোক্ষ, কৈবল্য, যোগারূঢ় এবং বৌদ্ধদর্শনে বোধিলাভ। তাছাড়া নির্বাণ, জেন, ফানহা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে। এই জগতের পালনকারী মহা মনসানাথজী।

সত্য যুগের তিন নাথ আচার্য।

(১) আদিনাথ শিবজী। (২) পাগলা নাথজী। (৩) মাৎসেন্দ্র নাথজী।

ত্রেতাযুগের চারজন নাথ আচার্য।

(১) অবগতি নাথজী বা শ্রীরাম নাথজী। (২) চৌরঙ্গী নাথজী বা চন্দ্রমা নাথজী। (৩) গোরক্ষ নাথজী। (৪) শিব অবতার ভক্ত হনুমানজী।

দ্বাপর যুগের চারজন নাথ আচার্য।

(১) মৎসেন্দ্র নাথজী। (২) গোরক্ষ নাথজী। (৩) পরশুরামজী। (৪) সন্তোষ নাথজী বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাথজী। কলিযুগের একজন মাত্র প্রধান নাথ আচার্য। অমর মহা হঠযোগেশ্বর গোরক্ষ নাথজী পরমেশ্বর।

এখানে লক্ষণীয় বিষয়, পাঁচটি যুগের প্রধান তিনটি যুগেই মাৎসেন্দ্র নাথজী ও গোরক্ষ নাথজীর অবস্থান। একই সঙ্গে ত্রেতাযুগে চন্দ্র নাথজী যিনি চৌরঙ্গী নাথ নামেও উল্লেখিত, তার সন্ধান পাই, অথচ আমরা সবাই মোটামুটি জানি আজ থেকে আনুমানিক দশম শতকে নাথ আচার্য যোগী চৌরঙ্গী নাথজীর আবির্ভাব যিনি গুরু গোরক্ষ নাথজীর শিষ্য ছিলেন ও অধুনা কালীঘাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তাই অনুমিত হয়, মৎসেন্দ্র নাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গী নাথ নামে বিভিন্ন কালপর্যায়ে একাধিক আচার্য ছিলেন।

আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নাথ দর্শনে পরম যোগী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ নাথ শৈব দর্শনে এরা স্বয়ং যোগেশ্বর।

নাথ দর্শনের মূল আদর্শ হলো, অপক্ক মানব শরীরকে যৌগিক সাধনায় পক্ক করে সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতালাভের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ তনু ও শরীরের মূলাধারে অবস্থিত কুণ্ডলীকৃত জীবনীশক্তিকে সহস্রারের কুল বা শিবের সঙ্গে একাত্ম করা। ফলস্বরূপ শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া বা মোক্ষলাভ ও দিব্যতনু লাভ। নাথ দর্শনের এই ক্রমশ সিদ্ধিলাভের পর্যায় বা সিদ্ধাই হওয়ার সাধনার কথা প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে ঋদ্ধি বা অভিজ্ঞা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেও অষ্টসিদ্ধির উল্লেখ আছে, যেমন— অমিনা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, বশিত্ব ঈশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব।

শাক্ত তান্ত্রিক গ্রন্থ 'ললিতা সহস্রনাম'-এ তিন রকম সাধনার উল্লেখ আছে— দিব্য, মানব ও সিদ্ধ। এই সাধন পরম্পরা অনুযায়ীই হয়তো বিভিন্ন তান্ত্রিক গ্রন্থে নাথ দর্শনের সিদ্ধকুল, সিদ্ধামৃত ইত্যাদি সম্প্রদায় এবং সিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী সিদ্ধদের সংখ্যা চুরাশিজন যাঁরা যোগের দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত বর্ণরত্নাকরে চুরাশিজন সিদ্ধের উল্লেখ আছে। তিব্বতি তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে এঁদের জীবনী দেওয়া আছে। এই সিদ্ধাচার্যরা হলেন—

লুহি, লীলা, বিরু, ডোম্বী, শবরী, সরহ, কঙ্কালী, মীন, গোরক্ষ, চৌরঙ্গী, বীণা, শান্তি, তান্তি, চর্মরী, খড়্গ, নাগার্জুন, কান্থ, কানরী, থগন, নাড়, শালি, তিলো, ছত্র, ভদ্র, দ্বিখণ্ডী, অযোগী, কড়, ধোবি, কংকন, কম্বল, তেঙ্কি, ভাদে, তদ্ধি, কুক্কুরী, চুজ্বী, ধর্ম, মহী, অচিন্ত্য, বভহি, নলিন, ভুসুকু, ইন্দ্রভূতি, মেঘ, কুঠারী, কর্মার, জালন্ধী, রাহুল, গর্ভরী, ধকরী, মেদিনী, পঙ্কজ, ঘণ্টা, যোগী, চেলুক, বাগুরী, লুঞ্চক, নির্গুণ, জয়ানন্দ, চর্যটি, চম্পক, বিষাণ, ভলি বা তেলি, কুমরী, চার্পটি, মণিভদ্রা, মেঘলা, মংখালা, কলকল, কন্থড়ি, দৌধি, উধলি, কপাল, কিল, পুষ্কর, সর্বভক্ষ্য, নাগবোধি, দারিক,পুত্তলি, পনহ, কোকিলা, অনঙ্গ, লক্ষ্মীঙ্করা, সামুদ্র ও ভলি।'

উল্লেখযোগ্য হলো, বিভিন্ন গ্রন্থে সিদ্ধাইদের নামের মধ্যে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা গেলেও নাথধর্মের প্রধান প্রবক্তারা যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরী প্রভৃতি নাম সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। চর্যাগীতিকোশ বা চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে কানরী, ভাদে, ভুসুকু, দারিক, ধর্ম, ডোম্বী, গুণ্ডরী, জয়ানন্দ, জালন্ধর, কম্বল, কুক্কুরী, কঙ্কন, লুহি, মহী, শান্তি, শবর, তান্তি, তেণ্টনা, বীণা, কান্থ ও সরহ প্রভৃতি সিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল সিদ্ধদের খবর ও তাঁদের কারও কারও রচনার অনুবাদ তিব্বতি তাঞ্জুরগ্রন্থমালায় বর্তমান। যাঁদের বিষয় সেখানে উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হলেন ইন্দ্রভূতি, কেরলী, অজ মহাসুখ, সরহ, মহাশবর, নারো, আর্যদেব, কৃষ্ণ (কান্হ), বিরু, বিরু, কর্ম, কিলো, শান্তিদেব, লুহি, খগন, ভাদে (ভাঙদে), ধর্ম, মহী, শবরী, কম্বল, চাতে, কঙ্কালী, মীন, অচিন্দ, গোরক্ষ, চোরংঘি (চৌরঙ্গী), বীণা, তান্তি, শিয়ালী, আজাকি, পঙ্কজ, ডোম্বী, কুক্কুরী, কর্মরী, চার্পটি, জালন্ধরী, কান্হরি, লুঞ্চক, গর্ভরি প্রভৃতি। এই সকল সিদ্ধদের অধিকাংশই দশম ও একাদশ শতকের মানুষ' —(ভারতীয় ধর্মের ইতহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)।

নাথ সিদ্ধরা মূলত গুরুবাদী। গুরুই শিষ্যকে সাধনায় দীক্ষিত করেন তার গ্রহণশক্তি অনুযায়ী। এই হিসেবে সাধনার পাঁচটি কুল বর্তমান— ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী— যেগুলি যথাক্রমে পাঁচটি আকারের প্রতীক। সিদ্ধিলাভের সাধনা মূলত কায়-সাধনা। এই মত অনুযায়ী দেহে বত্রিশটি নাড়ী বর্তমান যেগুলির মধ্য দিয়ে শক্তি প্রবাহিত হয়, যার মূলকেন্দ্র নাভির নিম্নদেশ। শক্তির সর্বোচ্চ আধার মহাসুখস্থান নামে কল্পিত। ওই বত্রিশটি নাড়ীর নানারকম নাম আছে— ললনা, রমণা, অবধূতী, প্রবণা, কৃষ্ণরূপিণী, সামান্যা, পাবকী, সুমনা, কামিনী প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে তিনটি— ললনা, রমণা ও অবধূতী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তন্ত্রে সেগুলিকে বলা হয়েছে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। সর্বোচ্চ স্থানটি যা মহাসুখস্থান নামে পরিচিত একটি সহস্রদল পদ্মরূপে কল্পিত। কয়েকটি বিরতিস্থান অতিক্রম করে শক্তি সেখানে পৌঁছায়। এই বিরতি স্থানগুলি তান্ত্রিক পীঠস্থানসমূহের নামে পরিচিত, যেমন— উড্ডীয়ান, জালন্ধর,

পূর্ণগরি, কামরূপ। সাধকের লক্ষ্য সহজের উপলব্ধি। সহজ সব কিছুর উৎস, যা চিরন্তন সুখ ও অনির্বচনীয় আনন্দের আকর, যেখানে সকল অনুভূতিকে মিশিয়ে দিলেই চরম অদ্বয়বোধের উপলব্ধি ঘটে। সাধক তখন নিজেকে অন্য কিছুর থেকে পৃথক করে দেখেন না। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথের ভাষ্যে— 'মুক্তির পর আত্মার মুক্তি নয়, মুক্তি ইহজীবনেই। তাই নাথ সিদ্ধিপন্থার সাধকরা জীবন্মুক্তি শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। কায়সাধনের দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায়। জীবনদায়িকা শুক্র বা বীর্য বোধিচিত্তরূপে কল্পিত, যাকে পরাবৃত্তি বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিপরীত প্রবৃত্তি অনুসরণে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারলে অমরত্বের পথ সুগম হয়। বোধিচিত্ত চর্চা রসায়নের সঙ্গেও সম্পর্কিত এবং সে কারণেই রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। দেহের মধ্যে যে অস্থির রসস্রোত বইছে তাকে কঠিন করা, অর্থাৎ বজ্রে পরিণত করা দরকার, তবেই সকল বৃত্তির স্থিরতা আসবে। এই উদ্দেশ্যে পারদঘটিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন, কেননা সাধারণ মরণশীল দেহকে দিব্যদেহে পরিণত করা দরকার। তত্ত্বের দিক থেকে বলা হয় মানবদেহ অশুদ্ধ মায়া বা অশুদ্ধ বস্তু দিয়ে গঠিত, কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলিকে শুদ্ধ মায়া বা শুদ্ধ বস্তুতে পরিণত করতে হবে। দেহের তিন রকম রূপান্তর হতে পারে— মন্ত্র তনু, প্রণব তনু ও দিব্যতনু। পাকাপাকিভাবে জীবন্মুক্তি ঘটলে সেই অবস্থাকে পরমুক্তি বলা হয়'—(ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস)।

নাথ সিদ্ধগণ-সহ কায়সাধনকারী সকল সম্প্রদায় এই তান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী যে, দেহই হচ্ছে বস্তুজগতের সংক্ষিপ্ত রূপ। পর্বত, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, নদী, বস্তুজগতের সবকিছুই দেহের মধ্যে অবস্থিত। হঠযোগের দ্বারা দেহ ও মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করা যায়। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, শিব ও শক্তি দেহে বাস করেন, শিব থাকেন সহস্রারে, শক্তি থাকেন মূলাধারে। দেহের দক্ষিণার্ধ শিব, বামার্ধ শক্তি। ডান দিকের নাড়ী পিঙ্গলা দিয়ে শিবের আদর্শস্বরূপ অপান বায়ু প্রবাহিত হয়। বামদিকের নাড়ী ইড়া দিয়ে শক্তির আদর্শরূপ প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়। সাধক যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে এই দুই প্রবাহকে মধ্য অঞ্চলে বা সুষুম্না কাণ্ডে নিয়ে আসবেন এবং তাহলে দুই ধারার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাম্যাবস্থা ঘটবে। পুরুষ শিবের প্রতীক, নারী শক্তির। তাদের যৌগিক মিলন চরম অদ্বয়বোধজনিত মহাসুখের কারণ হবে। এটাই অদ্বৈতবাদী, সিদ্ধপন্থী নাথ সাধকের লক্ষ্য।

সমগ্র নাথ দর্শনে আদিনাথ শঙ্করের পরে, গুরু গোরক্ষনাথজীর মতো এত প্রভাবশালী আর কেউ নেই। নাথ দর্শনে ও সাধন প্রণালীতে নাদানুসন্ধান বা নাথ সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। দীক্ষান্তে নাথগুরু তার শিষ্যের গলায় নাদী-পবিত্রী (কাঠের, ধাতুর বা হাতির দাঁতের তৈরি এক ধরনের দেড় থেকে দুই ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ও মুসুর ডালের আকারের ছিদ্র যুক্ত ফাঁপা নল ও অর্ধ ইঞ্চি মাপের গোলাকার রিং) ও কালো ভেড়ার লোম দিয়ে খুব সরু আকারের ১৬টি তন্তু একসঙ্গে পাক দিয়ে, মন্ত্র জপের সঙ্গে, তিনটি পর্বে ৬ বার পাক দিয়ে, ৯৬ আঙ্গুল লম্বা পইতে বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করান। এই পইতে বা উপবীত সূত্রকে গিঁট বেঁধে দেওয়ার আগে এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে, নাদী-রক্ত প্রবাল-স্ফটিক-রুদ্রাক্ষ দানা ও পবিত্রী একটি রেশমি সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়।

এই নাদি-পবিত্রী প্রস্তুতিও রহস্যময় নাথ দর্শনের এক উচ্চ মার্গকে প্রকাশ করে। এর ১৬টি তত্ত্বের (৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় + ক্ষিতি-অপঃ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম— শরীরের এই ৫টি মৌলিক উপাদান + মন = ১৬) উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার শক্তিকে প্রতিফলিত করে। ৩টি পর্ব দেহস্থ প্রধান তিনটি স্নায়ুমার্গ ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না তথা প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, তিন অবস্থা সূক্ষ্ম-স্থূল-অব্যক্ত, তিন পরিণতি ইচ্ছা-কর্ম-জ্ঞান ও সূর্য-চন্দ্র-অগ্নি এই ত্রি-অম্বকের প্রতিনিধিত্ব করে। ৯৬ আঙ্গুল জনিউয়ের রহস্য হলো— এটি ধারণকারী যোগী ৬৪ কলা আর ৩২টি বিদ্যা মোট ৯৬টি বিষয় আয়ত্ত করার প্রয়াসী। ৪টি বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব) + ৪টি উপবেদ (আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব বেদ, অর্থবেদ) + ৬টি বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ) + ৬টি দর্শন (সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত) + ৩টি সূত্র গ্রন্থ্য (যদিও সূত্র গ্রন্থি ৪টি। শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্ক। কিন্তু গৃহ্য সূত্র শুধুমাত্র পারিবারিক আইন-কানুন বিষয় সংক্রান্ত হওয়ায় তা সন্ন্যাসী ও যোগীদের মধ্যে গৃহীত হয় না) + ৯টি আরণ্যক মিলে মোট ৩২টি বিদ্যা নাথ যোগীদের আয়ত্ত করতে হয়। এছাড়া রুচি ও প্রতিভা অনুযায়ী বাস্তু নির্মাণ, ব্যঞ্জন কলা (রান্না), চিত্রকারী, সাহিত্য, কলা, ভাষা বিজ্ঞান, যন্ত্র নির্মাণ, কারুশিল্প, চারুশিল্প, বস্ত্রবয়ন, আভূষণ নির্মাণ, কৃষি জ্ঞান, কাব্য রচনা, স্থাপত্যবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাথমিক ও বিষ চিকিৎসা, জ্যোতিষ গণনা, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র বিশারদ-সহ মোট ৬৪টি কলার চর্চাও নাথ যোগীদের করণীয় কর্তব্য।

নাথ দর্শনে পইতেকে ৬টি পর্বে পাক দেওয়ার অর্থ হলো ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য)-কে নিয়ন্ত্রণ করে যোগীকে ৬টি গুণ (সদাচার, বিদ্যা, শম, দম, তপস্যা ও অহিংসা) অর্জন করতে হয়। পর্যায়ক্রমে জুড়ে থাকা 'পবিত্রী' হলো পরাশক্তি, পবিত্রতা, চিদানন্দ ও অর্ধমাত্রার প্রতীক। রক্তপ্রবাল দানা হলো ভগবান ব্রহ্মা, উৎপত্তি, রজোগুণ, ব্রহ্মানন্দ, ওঁকারের 'অ'-কার ও ব্রহ্মগ্রন্থীর প্রতীক। স্ফটিক দানা হলো ভগবান বিষ্ণু, স্থিতি, সত্যযুগ, মহানন্দ, ওঁকারের 'উ'-কার ও বিষ্ণুগ্রন্থির প্রতীক। রুদ্রাক্ষ হলো ভগবান শিব, সংহার, তমোযুগ, কৈবল্যানন্দ, ওঁকারের 'ম'-কার ও রুদ্র গ্রন্থির প্রতীক এবং 'নাদী' হলো ব্রহ্মনাদ বা লয়যোগ সাধনার যন্ত্রবিশেষ।

প্রতিটি নাথ সাধককে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপাস্য ঈশ্বর ও গুরুর কাছে এই নাদ শৈলীতে নাভি, হৃদয় ও কণ্ঠ (মণিপুর চক্র- অনাহত চক্র-বিশুদধ চক্র) থেকে শ্বাসের ঠোক্কর লাগিয়ে তীব্র ধ্বনি উৎপন্ন করার (গুরুমুখী নাদানুসন্ধান সাধন ক্রিয়া) জন্য অনুশীলন করতে হয়। তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ালো, যখন যোগী নাথসাধক নাদ সাধনা করেন তখন শিবসতী গ্রন্থি (Pituitary Gland), যাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় সোমচক্র বলা হয়, সেখান থেকে যে প্রধান ধাতুরস বা ভেসোপ্রেসিন নামক মাস্টার হরমোন ক্ষরণ হয় তা সমস্ত শরীরের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা Endocrine System or Gland-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে জীবদেহ সুষ্ঠভাবে জীবিত থাকে। যেহেতু মস্তিষ্কের বামদিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি সোমচক্র থেকে এই জীবনীশক্তিসম্পন্ন ধাতুরস বা জীবনদায়ী অমৃত ক্ষরিত হয়, তাই একে 'সোমরস'-ও বলা হয় এবং ভগবান শিবে বা আদিনাথ থেকে সমস্ত দিব্যৌর্ঘ্য ও সিদ্ধৌর্ঘ্য গুরুর মস্তিষ্কের ওপরে, বামদিকে এর প্রতীক হিসেবে অর্ধচন্দ্র শোভা পায়। □

ধন্বন্তরি অবতারে ভগবান বিষ্ণু চিকিৎসাশাস্ত্র প্রদান করেন

কুশল বরণ চক্রবর্ত্তী

সংসারে জীব যখন বিপদে পড়ে তখন ভগবানই অবতাররূপে এসে তাদের রক্ষা করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেন। পুরাণ অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর চব্বিশ অবতারের মধ্যে একজন অবতার হলেন বৈদ্য বা চিকিৎসক। তাঁর নাম ধন্বন্তরি। শাস্ত্রে ধন্বন্তরিকে চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদের অধিপতি দেবতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধন্বন্তরির হাতে শঙ্খ ও চক্র ছাড়াও আছে সকল ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে অমৃত কলশ। কার্তিক মাসের ধন্বন্তরি ত্রয়োদশীর পবিত্র তিথিতে আবির্ভূত হন চিকিৎসকরূপে ভগবান অবতার। তিথিটি চিকিৎসক ও সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক পুণ্যতিথি। পুরাণ মতে এই তিথিতেই ধন্বন্তরি দেবতা ও অসুরের সমুদ্রমন্থনে ধন্বন্তরি আবির্ভূত হন। দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল সমুদ্রমন্থন শেষে কলসপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত অমৃত আনয়ন করে তিনি অমৃতাচার্য হিসেবে অভিহিত হন। পরে তিনি কাশীরাজ দীর্ঘতমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুশ্রুতকে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদান করেন।

সেই থেকে আয়ুর্বেদ নামে চিকিৎসাবিদ্যার উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে কয়েকজন ঋষি ধন্বন্তরি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ভগবান ধন্বন্তরিত সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে বলা হয়েছে—

ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমের চ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া।।

(শ্রীমদ্ভাগবত : ১.৩.১৭)

''দ্বাদশতম অবতার রূপে জগতে আসেন ধন্বন্তরি মূর্তি ধারণ করে। তিনি অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ অবতারে ভগবান মোহিনীরূপ ধারণ করে দানবদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত দান করিয়েছিলেন।''

এখনও কোনো চিকিৎসকের যদি চিকিৎসায় ভালো হাতযশ হয়, তার চিকিৎসায় যদি মানুষ দ্রুত আরোগ্য লাভ করে, তবে সেই ডাক্তারকে আমরা বলি, তিনি ডাক্তার নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। কথাটির মধ্যে অত্যুক্তি থাকলেও এটা ক্ষতিকর নয়; এরমধ্যে প্রেরণা আছে। প্রেরণা মানুষকে উজ্জীবিত করে, উৎসাহিত করে এবং সর্বোপরি কর্মচাঞ্চল্যময় করে। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, কীর্তিস্বরূপ ও চিরায়ুপ্রদাতা ভগবান ধন্বন্তরির পবিত্র নাম স্মরণেও মানুষ বিবিধ প্রকারের মহাব্যাধি থেকে মুক্ত হয়। ভগবান বিষ্ণু ধন্বন্তরি অবতারে বৈদ্যাচার্য বা ডাক্তাররূপে আবির্ভূত হয়ে 'আয়ুর্বেদশাস্ত্র' প্রবর্তন করেন।

ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব কীর্তির্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ আশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধ আয়ুশ্চ বেদমনুশাস্ত্যবতীর্য লোকে।

(শ্রীমদ্ভাগবত ঃ ২.৭.২১)

''সেই ভগবান জগতে স্বয়ং মূর্তিমান কীর্তিস্বরূপ ও চিরায়ুপ্রদাতা ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হয়ে কেবলমাত্র তাঁর নামের দ্বারাই মানুষের মহারোগ আরোগ্য করেন। অমৃতপান করিয়ে তিনি দেবতাদের অমরত্ব প্রদান করেন এবং অসুরকবলিত যজ্ঞভাগ দেবগণকে পুনরায় প্রদান করেন। এই অবতারে তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রবর্তন করেন।'' ▯

নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে মাথা তুলে দাঁড়াল রমনা কালী মন্দির

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে মাথা তুলে দাঁড়ালো প্রায় পাঁচশো বছরের ইতিহাসের সাক্ষী রমনা কালী মন্দির। ভারত সরকারের সহায়তায় নির্মিত নতুন মন্দির উদ্বোধন করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চের কালো রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিকল্পনার অধীনে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার পর ২৭ মার্চ রাতে হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় রেসকোর্স ময়দানের ভেতরে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) অবস্থিত ঐতিহাসিক রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ীর আশ্রম। এখানে হত্যা করা হয় পুরোহিত-সহ একশোরও বেশি ভক্ত এবং মন্দির ও আশ্রমের আবাসিকদের। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময়ে মন্দির ও আশ্রম নির্মিত হয়নি। বরং মন্দির নির্মাণ ও পুজোর আয়োজনের চেষ্টা বাধা পেয়েছে। ২০০০ সালে হিন্দু সমাজের আন্দোলনের মুখে দেবোত্তর ভূমিতে পুজোর অনুমতি পাওয়া যায়, প্রতিষ্ঠিত হয় অস্থায়ী মন্দির। কিন্তু দেবোত্তর ভূমির বেশ কিছু অংশ স্বাধীনতা কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে রমনা কালী মন্দির আপন মহিমায় প্রকাশিত হলো।

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসে রামনাথ কোবিন্দ শুক্রবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় নতুন মন্দির উদ্বোধন করেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী সবিতা কোবিন্দ ও মেয়ে স্বাতী কোবিন্দ সঙ্গে ছিলেন। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান ধর্মপ্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান। এছাড়া কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি কালী মন্দিরের নতুন ভবন ও সংস্কার হওয়া অংশের ফলক উন্মোচন করেন এবং পরে স্ত্রী ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের পূজা দেন। মূল মন্দিরে ঢোকার সময় শাঁখ বাজিয়ে সনাতন রীতিতে অভিবাদন জানানো হয় ভারতের রাষ্ট্রপতিকে। প্রার্থনা শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত মন্দির কমিটির সদস্য এবং হিন্দু প্রতিনিধিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।

শংকরাচার্যের অনুগামী দশনামী সম্প্রদায় ঢাকার রমনায় এই কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে বদ্রীনারায়ণের যোশী মঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি ঢাকায় এসে রমনায় প্রথমে একটি আখড়া গড়েন। তখন এই আখড়া কাঠঘর নামে পরিচিত ছিল। পরে সেই জায়গাতেই হরিচরণ গিরি মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন, যা তখন পরিচিতি পায় কালীবাড়ি নামে। প্রায় তিনশো বছর আগে নির্মিত এই মন্দিরটিই ১৯৭৯ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলায় বিধ্বস্ত হয়। প্রাচীন আখড়ার পাশে হরিচরণ গিরি নির্মিত নতুন মন্দিরটি ছিল হিন্দু স্থাপত্যরীতির প্রতীক। মূল মন্দিরের দ্বিতল থেকে ১২০ ফুট উঁচু চূড়ো বহু দূর থেকে চোখে পড়তো। একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের বহুল প্রচারিত আলোকচিত্রে এই চূড়োই রমনার ল্যান্ডমার্ক হিসেবে চোখে পড়ে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠের মাঝখানে প্রাচীর ঘেরা মন্দিরে ভদ্রকালীর মূর্তি সুন্দর একটি কাঠের সিংহাসনে স্থাপিত ছিল। এই মূর্তির ডানদিকেই ছিল ভাওয়ালের কালী মূর্তি।

মন্দিরের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমে ছিল পূজারি, সেবায়েত ও অন্যান্য ভক্তদের থাকার ঘর। পাশে ছিল একটি শিবমন্দির। আরও ছিল একটি নাটমন্দির ও সিংহদরজা। কালী মন্দিরের সামনের দিঘিটি কাটিয়েছিলেন ভাওয়ালের রানি বিলাসমণি।

রমনা কালী মন্দিরের উত্তর পাশে ছিল মা আনন্দময়ীর আশ্রম। মা আনন্দময়ী সারা ভারতে সাধিকা হিসেবে পূজিতা হন। ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর ভক্তরা রমনা ও সিদ্ধেশ্বরীতে দুটি আশ্রম তৈরি করেছিলেন। পরে তিনি ভারতে চলে যান। রমনায় মা আনন্দময়ীর আশ্রমের প্রবেশদ্বার ছিল পূর্বদিকে। পশ্চিমদিকে একটি নাটমন্দির ছিল। তার উত্তরদিকে ছোটো একটি ইটের কোঠায় মা আনন্দময়ীর পাদপদ্ম সংরক্ষিত ছিল। কোঠাসংলগ্ন আশ্রম মন্দিরের বেদীর ওপরে বিষ্ণু ও অন্নপূর্ণা বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। বছরে মাত্র একবার মা আনন্দময়ীর জন্মোৎসবের সময় ওই মূর্তি বের করা হতো। মা আনন্দময়ী থাকতেন উত্তর-পূর্বদিকে একটি চৌচালা খড়ের ঘরে।

২০০০ সালে গঠিত 'রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ গণতন্ত্র কমিশন'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙ্গালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ২৬ মার্চ সকাল এগারোটা পাকিস্তানি বাহিনী প্রথম মন্দির ও আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। তারা মন্দির ও আশ্রমবাসীদের না বেরোনার জন্য বলে যায়। এ সময় পুরনো ঢাকা থেকে সত্তরের নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লিগ প্রার্থী এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর খাজা খয়েরউদ্দিনকে পাকসেনাদের সঙ্গে দেখা গেছে। ২৭ মার্চ গভীর রাতে রমনায় ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড প্রধানত তারই প্ররোচনায় সংঘটিত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানি বাহিনী সান্ধ্য আইনের মধ্যেই তাদের সহযোগীদের নিয়ে ২৭ মার্চ রাত দুটোয় রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ীর আশ্রম ঘেরাও করে। সেনাবাহিনীর সার্চলাইটের আলোয় গোটা রমনা এলাকা আলোকিত হয়ে যায়। এরই মধ্যে শুরু হয় গোলাবর্ষণ। রমনা কালী মন্দিরে ঢুকে পাকিস্তানিরা মূর্তির দিকে এক ধরনের বিস্ফোরক ছুঁড়ে দেয়। অবশ্য কারো কারো মতে গোলাবর্ষণ করা হয়। ফলে মূর্তি-সহ মন্দিরের পেছনের অংশ উড়ে যায়। মন্দির ও আশ্রম ধ্বংস করা হয়। মন্দির ও আশ্রম এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢোকার সময় অনেকে ঘুমিয়ে ছিলেন, কেউ কেউ উৎকণ্ঠায় জেগে ছিলেন। এই সময় আচমকা পাকিস্তানি বাহিনী হানা দিলে প্রাণভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। আতঙ্কিত সবাই পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে শুরু করেন। মেয়েরা শাঁখা খুলে ফেলেন, সিঁদুর মুছে ফেলেন। মন্দির ও আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে অনেকে লুকিয়ে পড়েন। পাকিস্তানি সেনারা বন্দুকের মুখে তাদের খুঁজে বের করে এবং মন্দিরের সামনে এনে দাঁড় করায়। পুরুষদের এক লাইনে এবং মহিলা ও শিশুদের অন্য লাইনে দাঁড় করানো হয়।

গণতদন্ত কমিশন বলেছে, পাকিস্তানি সেনারা সবার সামনে রমনা কালী মন্দিরের পুরোহিত পরমানন্দ গিরিকে কলেমা পড়তে বাধ্য করে এবং তারপরেই পেট বেয়নেট দিয়ে ফেড়ে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এভাবে আরও অনেককে কলেমা পড়িয়ে হত্যা করা হয়। কুৎসিত আনন্দ উল্লাস করতে করতে পাক সেনারা বলে, নৌকায় ভোট দেবার মজা বোঝ এবার। এরপর বাকি পুরুষদের ব্রাস ফায়ারে হত্যা করা হয়। সাক্ষ্য-বক্তব্যে জানা যায়, এখানে প্রায় ৮৫ থেকে ১০০ জনকে হত্যা করা হয়। ভয়াল এই দৃশ্য দেখে মহিলারা আর্তচিৎকার শুরু করলে তাদের বন্দুক দিয়ে পিটানো হয়। এতে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পাকিস্তানিরা মৃতদেহগুলো জড়ো করে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আহতদের অনেকে এতে পুড়ে মারা যায়। সাক্ষ্যে কয়েকজন মহিলা ও শিশুর পুড়ে মারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলেছেন, কয়েকটি শিশু আতঙ্কে কান্নাকাটি শুরু করলে তাদের ধরে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। পাক সেনারা দুজন যুবককে ধরে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে বাধ্য করে এবং মুখের ভিতর গুলি করে তাদের হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের সময় রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

আশ্রম ও মন্দিরের গোয়ালে ৫০টি মতো গোরু ছিল। গোরুগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ভয়াবহ আগুন, গোলাগুলি, মাংসপোড়া গন্ধ ও আর্তনাদে গোটা রমনা এলাকায় এক নারকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পাকিস্তানি বাহিনী রমনা অপারেশন শেষ করে ভোর চারটের দিকে ফিরে যাওয়ার সময় কিশোরী ও তরুণীদের নিয়ে যায়। তাদের আর কখনো ফিরে পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানি সেনারা নির্দেশ দিয়ে যায়, যারা হামলা থেকে বেঁচে গেলে তারা যেন পরদিনই ভারতে চলে যায়।

গণতদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্যে পাকিস্তানি হামলায় বেঁচে যাওয়া কয়েকজন বলেছেন, মন্দিরের পুরোহিত স্বামী পরমানন্দ গিরি মন্দির ও আশ্রমবাসীদের বরাভয় দিয়েছিলেন, পবিত্র ধর্মস্থান নিরাপদ। এখানে কোনো হামলা হবে না। তিনি বুঝতে পারেননি, '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসকাণ্ড থেকে মসজিদ যেমন রক্ষা পায়নি, মঠ, মন্দির, গির্জাও রক্ষা পেতে পারে না।

স্বাধীনতার পর সরকারিভাবে এই ঐতিহাসিক মন্দির নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং মন্দির ও আশ্রমের ভগ্নাবশেষ গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তারা শ্রমিক দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নেওয়া হয়। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মন্দির ও আশ্রমবাসী যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলার সময় কোনোভাবে পালাতে পেরেছিলেন তারা স্বাধীনতার পরপরই এখানে ফিরে আসেন। যথারীতি অস্থায়ী মন্দির গড়ে পুজোর্চনা শুরু করেন। বসবাসের উদ্যোগ নেন। ১৯৭৩ সালে তাদের সেখান থেকে পোস্তগোলা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর পুলিশ তাদের সেখান থেকেও উৎখাত করে এবং ভারতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সেখানে স্থাপন করা হয় সেনা ছাউনি। ২৭ মার্চ রাতে পাক হামলার মুখে পালাতে পেরেছিলেন পরমানন্দ গিরির স্ত্রী সুচেতা গিরি, মা আনন্দময়ী আশ্রমের সন্ন্যাসিনী জটালি মা-সহ কয়েকজন। তারা স্বাধীনতার পর আশ্রমপ্রাঙ্গণে ফিরে এসেও থাকতে পারেননি। চলে যেতে হয় পোস্তগোলা। যতদূর জানা যায় সুচেতা গিরি ও জটালি মা-সহ অনেকে ভারতে চলে যান এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

নবনির্মিত রমনা কালীমন্দির

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল শামসদের গণহত্যা এবং ধ্বংসকাণ্ডের নানা বিবরণ গণমাধ্যম ও সরকারি বিবরণে প্রকাশিত হলেও রমনার গণহত্যা ও ধ্বংসের কথা বিস্তারিত আসেনি। রমনায় মন্দির ও আশ্রম কেন পুনর্নির্মিত হয়নি এ নিয়ে তৎকালীন হিন্দু নেতৃবৃন্দ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেও কোনো সুফল পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০০০ সালের গোড়ার দিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কে এম সোবহান রমনার গণহত্যা নিয়ে গণতদন্তের উদ্যোগ নেন।

এই উদ্দেশ্যে তিনি সুধীজন ও গবেষকদের এক সভা আহ্বান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় গঠিত হয় 'রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ গণতদন্ত কমিশন'। কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বিচারপতি কেএম সোবহান। কমিশনের সদস্য করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসির মামুন ও সাংবাদিক, লেখক শাহরিয়ার কবিরকে। সদস্য- সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয় সাংবাদিক বাসুদেব ধরকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের দুটি ঘর বরাদ্দ করেন কমিশনের অফিসের জন্য। দীর্ঘ আট মাস কাজ করার পর কমিশন ১৪ সেপ্টেম্বর রমনায় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পরে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

কমিশনের তদন্তে গণহত্যায় নিহত ৫০ জনের নাম পাওয়া যায়। কমিশনে ২৭ মার্চ ও তৎপরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষদর্শী, মন্দির ও আশ্রমের বেঁচে যাওয়া কয়েকজন, সাংবাদিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ আশেপাশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও আবাসিকরা সাক্ষ্য দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক যারা প্রাণে বেঁচে যাওয়ার পর গ্রামে চলে গিয়েছিলেন তারাও কমিশনে সাক্ষ্য দেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দেন রমনা কালী মন্দিরের অদূরে অবস্থিত শাহবাজ জামে মসজিদের খাদেম আবদুল আলি ফকির। তিনি রমনা কালী মন্দিরের পুরোহিত পরমানন্দ গিরির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। পাকিস্তানি বাহিনী চলে যাওয়ার পর তিনি রমনায় আসেন।

স্বাধীনতার পর রমনা কালী মন্দির ও আশ্রমের বেঁচে যাওয়া ভক্ত শিষ্য যাঁরা রমনায় ফিরে আসেন তাদের নিয়ে এই আবদুল আলি ফকির প্রথম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ঐতিহাসিক মন্দির ও আশ্রম নির্মাণের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেন। তাঁর সঙ্গে সুচেতা গিরি ও জটালি মা ছিলেন।

এই সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পরাজিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজির নেতৃত্বে (প্রায় ৯০ হাজার সেনা) ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে আত্মসমর্পণ করেছিল বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি এই উদ্যানেই প্রথম জনসভায় ভাষণ দেন। এই উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতা কমপ্লেক্স। অমর একুশের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় এই উদ্যানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। আর এখানেই নতুন নান্দনিক সৌন্দর্যের কালী মন্দির স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়ালো দেবোত্তর ভূমিতে, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম। ◻

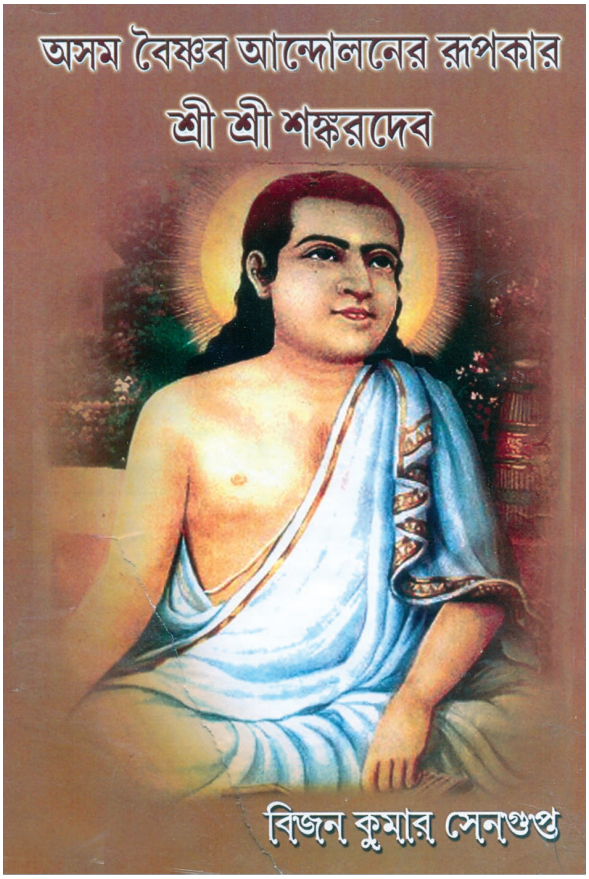

অসমে বৈষ্ণব আন্দোলনের রূপকার শ্রীশ্রী শঙ্করদেব

বিজয় আঢ্য

দ্বাদশ শতক থেকে প্রায় সারা ভারতে ইসলামিক শাসকদের রাজত্ব কায়েম থাকলেও শাশ্বত হিন্দুধর্মের ধারা সেই বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়েই চলেছে। এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিশেষত মধ্যযুগে (১১০০-১৮০০ খ্রি.) যে সকল মহাত্মা ধর্মগুরু আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা মানুষের চৈতন্যের বিকাশের জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের অন্যতম হলেন অসমের প্রাণপুরুষ ও ধর্মগুরু শ্রীশ্রীশঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮)। সে সময় অসম ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত ও ক্ষমতার স্বার্থে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষরত। সমাজের অধিকাংশ মানুষ শাক্ত এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজার্চনায় ব্যস্ত— এরকমই এক যুগপরিবেশে শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের আবির্ভাব। বাঙ্গলায় যেমন শ্রীচৈতন্যদেব, অসমে তেমন শ্রীশঙ্করদেব। তিনি সমগ্র অসমের একচ্ছত্র কিংবদন্তী মহাপুরুষ। তবে অসমের বাইরে তাঁর সেরকম বিশেষ কোনও পরিচিতি নেই।

অসমের বরদোয়ায় জমিদার ভুঁইয়া পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা কুসুম্বর, মাতা সত্যসন্ধা। মাত্র ৭ বছর বয়সেই বাবা-মা-কে হারানোর পর ঠাকুমা খেরসূতি দেবীই তার সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তবে জমিদারের বিলাস বৈভব কখনই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ভয়ডরহীন। টোলের আচার্যদেব মহেন্দ্র কন্দলীও অনুভব করেছিলেন যে তাঁর ছাত্রটি সাধারণ ছেলে নয়। তিনি উপাধি দিলেন 'দেব'। সেদিন থেকে তিনি শঙ্করদেব। কুড়ি বছরের মধ্যেই সব ধরনের বেদ-সংহিতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, সংস্কৃত, অভিধান-সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিও অধ্যয়ন শুধু নয়, আত্মস্থও করেন। এক সম্পন্ন ভুঁইয়ার মেয়ে সূর্যবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মেয়ে মনু বা হরিপ্রিয়ার জন্মাবার বছর শেষ না হতেই স্ত্রী বিয়োগ হয়। মেয়ের বিয়ে ও জমিদারির ভার কাকাদের হাতে দিয়ে তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ বারো বছর ধরে ভারতবর্ষের সব বিখ্যাত মঠ, মন্দির, তীর্থস্থানগুলি শুধু দর্শনই করেননি, সেই সব স্থানগুলির ইতিহাস, স্থানমাহাত্ম্য, সেখানকার সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতিও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তবে এই তীর্থদর্শনের ক্ষেত্রে রাম ও কৃষ্ণের জগন্নাথধাম তাঁকে বেশি টেনেছিল।

জীবন সম্পর্কে শঙ্করদেবের ধ্যানধারণা অনেক গভীর ও ব্যাপ্ত, অনেক বেশি উদার। ঈশ্বর ভক্তি, বিশ্বাস মানুষের মধ্যে প্রচার করতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন। অন্তরের ভক্তি, প্রেম দিয়েই যে ঈশ্বর লাভ করা যায়, সেটাই তিনি মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু বা তার অবতার কৃষ্ণকে তিনি পরমব্রহ্ম বলে মনে করতেন। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের নামগান করা বা শোনা এবং

নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণচরণে আশ্রয় নিলেই চলবে। তাঁর মত ছিল 'একেশ্বরবাদ'। শঙ্করদেবের মতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সঙ্গে সাধকের সম্পর্ক প্রভু ও দাসের মতো। কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে যে লীলাপর্ব (মাধুর্য রস) রয়েছে, তা তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণঃ ব্রজ' (১৮।৬৬)। ঈশ্বরলাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ বা উপঢৌকন, যোগসাধনা বা জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছানোরও প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে ভগবানকে পেতে ভক্তিই যথেষ্ট। তিনি তাঁর মতানুসরণকারীদের মধ্যে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেন। তাঁর কথা— বৃক্ষের গোড়াতে যেমন জল ঢাললে, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সমস্তই জল পেয়ে পুষ্ট হয়, তেমনই কৃষ্ণের উপাসনা করলেই সকলের পূজা করা হয়।

শ্রীমদভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের মূল সারাংশ নিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'গুণমালা' রচনা করেন। শঙ্করদেব তাঁর এই প্রচারিত ধর্মমতের নাম দেন 'এক শরণ নাম ধরম'। নয় প্রকার ভক্তিরসের মধ্যে তিনি শ্রবণ ও কীর্তনকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। 'ভক্তি রত্নাকর' ও ভক্তিমূলক গানের সংকলন 'বরগীত' (২৪০টি)-সহ শঙ্করদেবের রচনা সংখ্যা মোটামুটি ২৬টি। তাঁর রচিত নাটকগুলি অঙ্কীয়া নাটক (একাঙ্ক নাটক) নামে পরিচিত। এইসব একাঙ্ক নাটকের বিশেষত্ব হলো, বাদ্যযন্ত্রীদের শুদ্ধ সাদা পোশাক ও শিল্পীদের অলৌকিক সব মুখোশ।

অসম জাতির জন্য শঙ্করদেবের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো নামঘর বা কীর্তনঘর। নামঘর হলো ধর্মাচরণের মূল কেন্দ্র গৃহ। আবার নামঘরের পরিবর্ধিত রূপ হলো সত্র। অসমীয় বৈষ্ণব ধর্মে সত্র বোঝাতে বোঝায় মঠ বা আশ্রম। নামঘর কেবল মাত্র প্রার্থনা গৃহই নয়। একসঙ্গে নামকীর্তন ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকলকে একজোট করাই নামঘরের প্রধান উদ্দেশ্য। পাঁচশো বছর ধরে এই নামঘর বা কীর্তনঘর শঙ্করদেবের জীবনাদর্শ ও বাণীর প্রবহমানতাকে ভিত্তি করে বৃহত্তর অসমীয় সমাজকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

শঙ্করদেব কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না বা একজন নিছক ধর্মগুরু; তিনি এক সর্বজনীন সংস্কারধর্মী অনুভূতির জন্ম দিয়েছিলেন। শঙ্করদেব সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা ও অসাম্য দূর করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর জন্মের পাঁচশত বছর আগেই। জাতি, ধর্ম, বর্ণের বিভেদ ভুলে গিয়ে সকলকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিলেন। বস্তুত নতুন অসম গড়ে তোলার মূলে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল।

১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের ১১৯ বছরের বৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ জীবনের অবসান হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ও দুঃখেরও বিষয় যে, এই অনন্য সাধারণ, নানাভাবে অধিকারী মহান পুরুষটিকে অসম রাজ্য ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তাঁর কোনও তেমন পরিচিত নেই। এর একটা কারণ হয়তো ভারতীয় সংস্কৃতির বহুত্ববাদিতা। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'— সত্য এক, প্রকাশে বিভিন্ন। একের মধ্যে নয়, সর্বভূতেই ঈশ্বর দর্শন (All in one নয় one in all) —ভারতীয় জীবনের মর্মকথা। তবুও বলতে হয়, এতবড়ো মাপের এমন একজন মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বা অল্প-পরিচিতি লজ্জার বিষয়।

লেখক বিজন কুমার সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে তুলনায় অপরিচিত ধর্মগুরু শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের জীবনকথা ও তাঁর অবদান, বিশেষত অসমীয় সমাজে সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের জীবন ও সাধনার ক্রমবিকাশ এবং সেইসঙ্গে তৎকালীন অসমের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটির বিশ্লেষণ— লেখকের মননশীলতার পরিচয় দেয়। বৈষ্ণবশাস্ত্র, বিশেষত ভাগবত পুরাণ ও ভক্তির নব রসকে আস্বাদন করেছেন এবং সেই রস মাধুর্য ভক্তজনের মধ্যে প্রচারের বিবরণটি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, অসম সমাজের বিকাশে বরদোয় খান বা সত্র, অঙ্কীয়া নাট বা একাঙ্ক নাটক, খত্রিয়া নৃত্য, বৃন্দাবনী বস্ত্র ইত্যাদির গুরুত্বও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষা সাবলীল ও অন্তঃস্পর্শী। বাংলার আধ্যাত্মিক সাহিত্যে গ্রন্থটি একটি মূল্যবান সংযোজন। লেখকের এই প্রয়াস বহুল প্রচার লাভ করুক এবং পাঠক সমাজ তাঁর এই গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে সাধন পথে অগ্রসর হোক, এই প্রার্থনা।

পুস্তকের নাম : অসমে বৈষ্ণব আন্দোলনের রূপকার শ্রীশ্রী শঙ্করদেব। লেখক : বিজন কুমার সেনগুপ্ত।
প্রকাশক : বর্ণাশ্রম প্রকাশন সংস্থা।
মূল্য : ১৫০ টাকা।

বাঘ ও হরিণছানা

গভীর জঙ্গলে একটা বাঘ ও বাঘিনি থাকে। খায়, ঘুরে বেড়ায়, আর গাছের ছায়ায় বসে গল্প করে। আবার উঁচু উঁচু টিলার ওপর বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে থাকে। গাছের উঁচু ডালে তরতর করে উঠে পড়ে। ওপর

থেকে বনটাকে দেখে মনে হয় কত বড়ো। বাঘিনি বাঘকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গো, আমরা বনটাকে যতদূর দেখতে পাচ্ছি তার পরেও বন আছে তো? – জানি না, যখন ছোটো ছিলাম তখন মা-বাবার সঙ্গে থাকতাম, তাই খুব বেশিদূর যাওয়া হয়নি। তারপর মা-বাবা দুজনেই মরে গেল। তারপর তোমাকে পেলাম। ইচ্ছে করেই বেশিদূর যাই না। আমরা বাঘ, বাঘেদের মধ্যেই থাকা ভালো, তাই না? – ঠিকই বলেছ। গাছের ওপর শুয়ে থাকতে ওরা খুব ভালোবাসে। সন্ধ্যে হলে ওরা নিজেদের ডেরায় ফিরে যায়।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে বাঘ একটা গাছের গোড়ায় কোটর দেখতে পায়। –এই এদিকে আয়। বাঘিনি দেখল ওমা এটা তো একটা ঘর! –এর মধ্যে থাকবি?–থাকলে তো খুব ভালো হয় কিন্তু এরমধ্যে সাপটাপ নেই তো? বাঘ ভেতরে ঢুকে ভালো করে দেখল। নাঃ, কিছু নেই। –দাঁড়াও, একটু পরিষ্কার করে নিই। বাঘ বাঘিনিকে বলল অনেকটা বড়ো জায়গা, বেশ আরাম করে থাকা যাবে।

সেই গাছটি একটি প্রাচীন অশ্বত্থগাছ। অনেক ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। ওরা ভোরবেলায় কত রকম পাখির ডাক শোনে। ওদের মনে হয় কোনোদিন তো এত মন দিয়ে পাখির ডাক শোনেনি। মনে হচ্ছে ওরা অন্য কোনো বনে বেড়াতে এসেছে। অন্য বাঘেরা বলাবলি করে এরা একা একা থাকে, এদের কোনো ছেলেপুলে নেই। শুনে ভালো লাগে, এটা তো বাঘ-বাঘিনিরও মনের কথা। এরা ভাবে একটা ছানা থাকলে তাকে কত আদর করতাম, তার সঙ্গে খেলা করতাম। বাঘ বলে সবই ভাগ্য বলো, কী আর করবে! এইভাবে দিন গড়াতে থাকে।

একদিন ওরা দুজনে ঘুরতে বেরিয়েছে। ভীষণ গরম। গাছের ছায়ায় অন্য বাঘেরা বিশ্রাম নিচ্ছে। ওরা নিজেদের গাছের কাছে ফিরে এল। মনে হচ্ছে কোটরে কী যেন রয়েছে। সাবধানে বাঘ ভেতরে ঢুকে দেখল। ওমা একটা কীসের ছানা গো! বাঘিনি দৌড়ে এল। এটা তো একটা হরিণছানা। বাঘিনি সাবধানে ছানাটাকে কোলে নিল। বাঘকে বলল যাও কচি কচি ঘাস নিয়ে এস। বাঘ খানিকটা কচি ঘাস নিয়ে এল। ছানাটা ধীরে ধীরে ঘাসটুকু খেয়ে নিল।

ছানাটাকে নিয়ে ওরা কোটরেই থাকে। বাইরে বের হলে অন্য বাঘ খেয়ে ফেলবে যে! হরিণছানাটাকে নিজের ছানার মতোই ভালোবাসে। হরিণছানাটাও ওদেরই মা-বাবা বলে জানে। বাঘিনি বলল, জানো, আমাদের ছানা নেই, তাই বনদেবী দয়া করে এই ছানাটি দিয়েছেন। বাঘ বলল কিন্তু এই ছানাটাকে কি আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারব? মাঝে মাঝেই নেকড়ের দল হরিণছানাটাকে খেয়ে ফেলার জন্য কোটরের কাছে আসে তাই ওরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। ছানাটিকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না বলে ওদের ঠিকমতো খাওয়াও হয় না। ওরা খুবই চিন্তায় পড়ে গেল।

কীভাবে যেন খবর পেয়ে একদিন কয়েকজন সাহেব আসে জঙ্গলে। তারা গাছটির কাছে এসে ছবি তুলতে লাগল। বাঘিনি ছানাটিকে বুকের তলায় লুকিয়ে রাখল। সাহেবরা হাসে আর কী যেন বলাবলি করে। তারপর একদিন সাহেবদের সঙ্গে তাদের মেমেরাও আসে। বাঘ-বাঘিনি বুঝল এবার তারা কোনো ক্ষতি করবে না। তারা কোটরের কাছে বসে ছবি তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর আবার একদিন তারা একটি গাড়ি নিয়ে এল। বাঘ-বাঘিনি একটু খাবারের খোঁজে গিয়েছিল। এক মেমসাহেব হরিণছানাটিকে কোলে নিয়ে গাড়িতে বসল। গাড়ি চলতে লাগল। দেখতে পেয়ে বাঘ-বাঘিনিও গাড়িতে লাফিয়ে উঠে বসল। কলকাতায় এসে আলিপুর চিড়িখানায় হরিণদের মধ্যে ছানাটিকে ওরা ছেড়ে দিল। আর বাঘ-বাঘিনিকে ওদের জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিল। হরিণছানাটি প্রতিদিন জাফারির ধারে এসে দাঁড়াত, বাঘ-বাঘিনি অপলক দৃষ্টিতে ছানাটির দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন হরিণের দলে হরিণছানা মিশে গেল।

ওঃ, বলা হয়নি, একবছর পর বাঘ-বাঘিনিরও একটি ছানা হয়েছিল।

শুভ্রা দে

ভারতের বিপ্লবী

দীনেশচন্দ্র মজুমদার

দীনেশচন্দ্র মজুমদারের ১৯০৭ সালের ১৯ মে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটে জন্ম। কলেজে পড়ার সময় কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে লাঠি ও ছোরাখেলা শিক্ষা করেন। প্রতিবেশী বিপ্লবী অনুজা সেনের মাধ্যমে যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পরে দলনেতার নির্দেশে পূর্ববঙ্গের বগুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে ব্রতী হন। লাঠিখেলার শিক্ষক হিসেবে 'ছাত্রী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। টেগার্ট হত্যার পরিকল্পনায় তিনজনের অন্যতম হওয়ায় গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে পালিয়ে তিনি আত্মগোপন করেন। পরে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে ধরা পড়েন। বিচারে ১৯৩৪ সালের ৯ জুন তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- মুম্বাইকে ভারতের প্রবেশদ্বার বলা হয়।
- রাসবিহারী বসু 'পিএন ঠাকুর' ছদ্মনামে জাপানে পালিয়ে যান।
- পুলিনবিহারী দাস ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন করেন ।
- অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০২ সালে।
- যুগান্তর দল প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৬ সালে।
- বিপ্লবী যতীন দাস ৬৪ দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন।
- পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলনের মূল নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু।

ভালো কথা

বাঘে-মানুষে লড়াই

সুন্দরবনের গরিব মানুষদের প্রাণ হাতে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কখনো কাউকে বাঘের পেটে, কাউকে কুমিরের পেটে যেতে হয়। তাসত্ত্বেও তাদের বেঁচে থাকতে হয়। কয়েকদিন আগে সুন্দরবনের ঝাড়খালি গ্রামের মৎস্যজীবী মিহির সরদার ও বাবলু হালদার খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। সারাদিন কাঁকড়া ধরে সন্ধ্যায় তারা ডিঙিতে বসে রান্না করছিলেন। এমন সময় একটি বাঘ মিহির সরদারের ঘাড়ে কামড়ে ধরে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পাশে বসে থাকা বাবলু হালদার সঙ্গে সঙ্গে দা নিয়ে বাঘের পিঠে চেপে বসে কোপাতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ বাঘে-মানুষে লড়াই চলে। অবশেষে বাঘটি মিহির সরদারকে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তারপর বাবলু সরদার সঙ্গীকে নিয়ে ডিঙি বাইয়ে ক্যানিং হাসপাতালে আসে। বাবলু হালদারের অবস্থাও ভালো নয়, কিন্তু সঙ্গীকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য গর্বে তাঁর মুখ উজ্জ্বল।

শ্যামল হালদার, একাদশ শ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ক তি চা অ	(১) গ্য নু দ অ মো ন যো
(২) মা দে না আ	(২) খ্যা ই হা তি স বি ত

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) হিমশীতল (ভুলবশত 'হী' ছিল) (২) সাতকাহন

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) মুদ্রনপ্রমাদ (২) সপ্তাহকালীন

উত্তরদাতার নাম

(১) প্রিয়ব্রত মাহাত, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (২) শুভম সরকার, বেলঘড়িয়া, কল-৫৬। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯ (৪) অনামিকা পাল, শিলচর, অসম।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

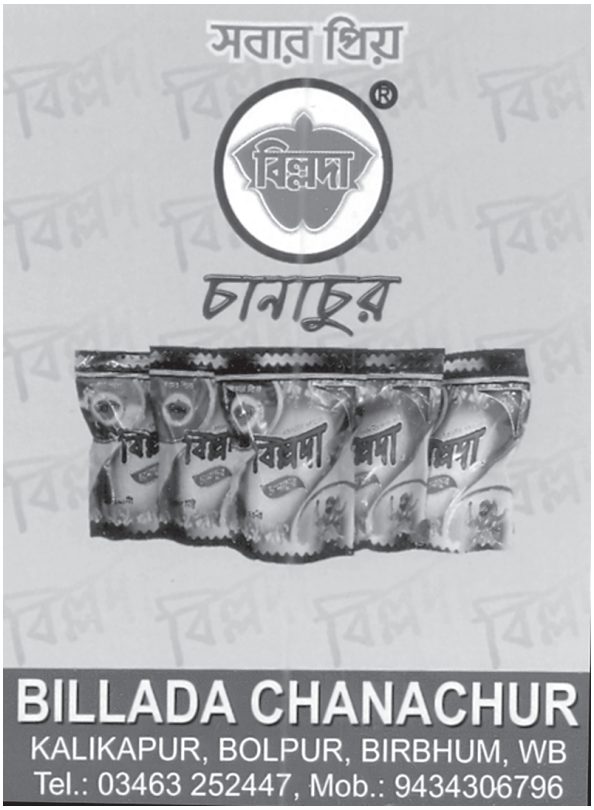

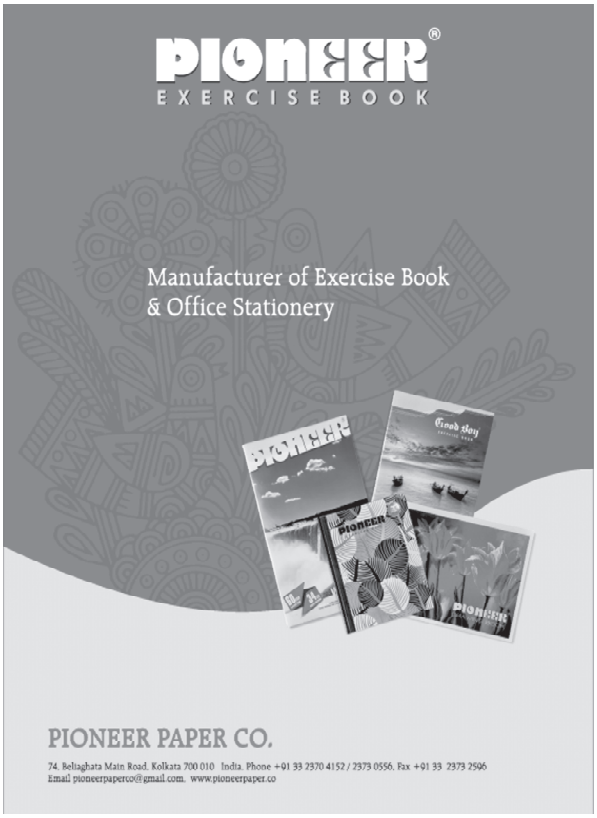

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ঈশাইনাথের সন্ধানে

যিশুখ্রিস্টের বাণী সনাতন ভাবধারা ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা থেকেই অনুপ্রাণিত

দেবাশিস চৌধুরী

1857CE-তে আবদুল নবি খন্যারির লেখা তারিখ-ই-হাসান গ্রন্থে (Vol. 1, Page 377) উল্লেখ রয়েছে গোপাদিত্যের রাজত্বকাল ছিল 49CE-109CE। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের এই বৌদ্ধবিহারে বা জ্যেষ্ঠেশ্বর মন্দিরে গোপাদিত্যের রাজত্বকালে একজন সিদ্ধপুরুষ তাঁর জীবদ্দশায় বাস করতেন---ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং যিশুখ্রিষ্ট। রাজা গোপাদিত্য যখন গোপাদ্রিতে জ্যেষ্ঠেশ্বরের প্রতিষ্ঠাকল্পে (রাজতরঙ্গিণী অনুযায়ী) অথবা জ্যেষ্ঠেশ্বরের পুরনো মন্দিরটির সংস্কারকল্পের (তারিখ-ই-কাশ্মীর অনুযায়ী 54CE) ব্রতী হলেন, স্থানীয় হিন্দুরা তখন আপত্তি করেছিলেন। 1420CE-তে মোল্লা নাদরির লেখা তারিখ-ই-কাশ্মীর (কাশ্মীরের ইতিহাস) গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, ইউজ আসফ নামক একজন সিদ্ধপুরুষ পবিত্র-ভূমি থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় এসে তাঁর অবতারত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি দিবারাত্র ঈশ্বর সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রাখতেন এবং আধ্যাত্মিকতা ও সদগুণের শিখরে পৌঁছেছিলেন। তিনি কাশ্মীরের মানুষের কাছে নিজেকে ঈশ্বরের দূত হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সবাইকে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাতেন। কারণ উপত্যকার মানুষ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। হিন্দুদের আপত্তির কথা গোপাদিত্য এই সিদ্ধপুরুষকে জানালে তিনি মন্দিরের বাস্তুকার সুলেমন (পারস্যের মানুষ, মতান্তরে তুরস্কের), যাঁকে হিন্দুরা সন্দিমন নামে ডাকতো, তাঁকে নির্দেশ দেন মন্দির-সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করতে এবং তিনি তখন মন্দিরের চূড়া সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করেন। বছরটি ছিল 54CE।

সংস্কারের পর সুলেমন (সন্দিমন) সিঁড়ির গায়ে প্রাচীন পারসিক লিপিতে লেখা দুটি ফলক স্থাপন করেন যার মধ্যে একটিতে লেখা—এইসময় (অর্থাৎ 54CE-তে) ইউজ আসফ এখানে তাঁর অবতারত্বের ঘোষণা করেছিলেন। অপরটিতে লেখা–তিনি (ইউজ আসফ) ছিলেন যিশু, ইসরায়েলের সন্তানদের অবতার। আশ্চর্যের বিষয়, রাজতরঙ্গিণীতে কিন্তু কোথাও ইউজ আসফ বা যিশুখ্রিস্টের বিষয়ে কোনও কিছুর উল্লেখ নেই। আবার পণ্ডিত আনন্দ কলের (১৯২৪) মতে, 'সন্দিমন' (অজ্ঞাত) এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর মতে সন্দিমন ২৬২৯ থেকে ১৫৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করেছিলেন। রাজা গোপাদিত্য (৪২৬-৩৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ও রাজা ললিতাদিত্য মুক্তিপাদ (৬৯৭-৭৩৪) এই মন্দিরটি সংস্কার করান।

পণ্ডিতদের পরস্পর বিরোধী মতবাদে প্রকৃত ইতিহাসটিই একটি ধাঁধায় পর্যবসিত হয়েছে। এই ধাঁধার ভিতর থেকেই প্রকৃত ইতিহাসকে খুঁজে নিতে হবে। সর্বপ্রথম পণ্ডিত আনন্দ কলের মতবাদ বর্জন করেছি, আমার মনে হয়েছে তাঁর গণনাকৃত লৌকিকাব্দের নিরিখে সাধারণাব্দের মানের হিসাবটি মিলছে না। কারণ গোপাদিত্যের রাজত্বকাল ৪২৬-৩৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ মেনে নিলে তা যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও আগের সময়কাল এবং সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল (273/268CE-232BCE) - এর ও দেড়-দুশো বছর আগের বলে মান্যতা দিতে হয়! আর সন্দিমনের রাজত্বকালের যা হিসাব, তখন তো হরপ্পা-সভ্যতার স্বর্ণযুগ! এবার 1420CE-তে মোল্লা নাদরির লেখা তারিখ-ই-কাশ্মীর (কাশ্মীরের ইতিহাস) গ্রন্থের বিষয়ে আসছি। এই গ্রন্থে যে '৫৪ সাল'-এর উল্লেখ রয়েছে তা সাধারণাব্দ (CE) অনুযায়ী যিশুখ্রিস্টের সময়কালের সঙ্গে মিলে গেলেও ওই সময়কালটি কিন্তু গোপাদিত্যের রাজত্বকাল (রাজতরঙ্গিণী অনুযায়ী)-এর সঙ্গে মিলছে না। প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী তা হুষ্ক বা কুষাণরাজ প্রথম কদফেসিসের (রাজত্বকাল : 15CE-65CE) সময়কালকে নির্দেশ করে। প্রামাণ্য ইতিহাসকে মান্যতা দিতে হলে এই সঙ্গত প্রশ্ন চলে আসে, তাহলে গোপাদিত্যের রাজত্বকালের (49CE-109CE) প্রকৃত সময়টি কীভাবে মান্যতা পাবে? এটা একমাত্র

তখনই সম্ভব হতে পারে যদি গোপাদিত্য কুষাণদের বশ্যতা মেনে নিয়ে কাশ্মীরে রাজত্ব করে থাকেন, যেমনটি রাজপুত রাজারা মুঘলদের আমলে করতেন। অর্থাৎ কাশ্মীররাজ গোপাদিত্য একজন 'স্বাধীন' রাজা হিসাবে কাশ্মীরে রাজত্ব করতেন না।

যিশুর তক্ষশীলা থেকে কাশ্মীরে আসার আগে তাঁর উপস্থিতির দুটি প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। প্রথমটি কাবুলের কাছে একটি সরোবর—ঈশা তালাও। প্রবাদ, এই সরবরে যিশু জলপান করেছিলেন। তবে প্রমাণ হিসাবে এটি খুবই দুর্বল। দ্বিতীয়টি, মা মেরির সমাধি। আজকের দিনে কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার যেমন জম্মু তেমনই অবিভক্ত ভারতে কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার ছিল রাওয়ালপিণ্ডি। এখান থেকে বাসে মুজাফ্‌রাবাদ হয়ে শ্রীনগর আসতে হতো। নিকোলাস নটোভিচ ও স্বামী অভেদানন্দ এই পথেই কাশ্মীর গিয়েছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মুজাফ্‌রাবাদ আসার পথে মারি নামে একটি ছোটো শহর আছে। এই শহরে রয়েছে মা-মেরির সমাধি। সমাধিস্থলের নাম সম্ভবত 'মাঈ মেরি কী আস্থান'। এখানে যে সমাধিটিকে মা মেরির সমাধি বলে চিহ্নিত করা হয় তার অবস্থান লম্বালম্বিভাবে পূর্ব-পশ্চিম দিক অনুযায়ী যা একান্ত ভাবেই ইহুদিদের সমাধি দেওয়ার রীতি। অন্যান্য সমাধিগুলি কিন্তু ইসলামিক রীতি অনুসারে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর অবস্থান করছে। জনশ্রুতি, মা-মেরি কাশ্মীর যাওয়ার পথে এখানে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর নামানুসারেই জায়গাটির নাম কোনও একসময় মারি হয়েছে। যিশুখ্রিস্ট যেমন প্রাণ রক্ষার্থে ভারতে চলে এসেছিলেন তারসঙ্গে তিনি হারিয়ে যাওয়া দশটি ইহুদি জনগোষ্ঠীর খোঁজেও ছিলেন। সম্ভবত নেবুচাদনেজারের রাজত্বকালে ওই জনগোষ্ঠীগুলি অত্যাচারিত হয়ে প্যালেস্টাইন থেকে চলে গিয়েছিল এবং প্রাচীন রেশম পথের (সিল্করুট) নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বসতি গড়ে তুলেছিল এবং জীবিকা হিসাবে পশুপালন বেছে নিয়েছিল। কাবুল, খাইবার-পাখতুনখোয়া, কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গায় এই জনগোষ্ঠীগুলির উপস্থিতি আজও বিদ্যমান এবং ভেড়া পালন প্রধান জীবিকা। বর্তমানে ইসলাম মতাবলম্বী হলেও এরা এখনো নিজেদের বনি ইসরাইলের (ইহুদি) বংশধর বলে দাবি করে এবং অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আগ্রহ দেখায় না। কাশ্মীরের গুটলিবাগ এইরকমই এক টাউন। সোনমার্গ যাওয়ার পথে শ্রীনগর-লে হাইওয়ের পাশে সিন্ধুনদীর তীরে এই গুটলিবাগের অবস্থান। এখানকার স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললে যে কেউ বিষয়টির সত্যতা জানতে পারবেন।

কাশ্মীরে যিশুর স্মৃতিবিজড়িত আর একটি জায়গার নাম আইশমোকাম। লিডার নদীকে সঙ্গে নিয়ে পহলগাঁও থেকে অনন্তনাগের দিকে আসতে মেন রাস্তার বাঁদিকে একটু ভিতরে টিলার উপর আইশমোকাম দরগা। জনপ্রিয় হিন্দি ছবি বজরঙ্গী ভাইজানের কিছু অংশের শুটিং হয়েছিল এখানে। যিশুর বিষয়ে আসার আগে অতি সংক্ষিপ্তাকারে আইশমোকামের ইতিহাস না বললে বিষয়টি পরিষ্কার হবে না। কাশ্মীরে সুফিবাদের একটি নিজস্ব ঋষি পরম্পরা ছিল। এই পরম্পরার সাধকদের নিছক ইসলামের অনুগামীরূপে দেখলে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। শ্রীনগর থেকে ইউজমার্গ আসার পথে পড়বে চারার-ই-শরিফ। এখানে আছে নন্দ ঋষি (Nund Rishi) নামের একজন সুফি সাধক (1377CE-1438CE)-এর সমাধি। নন্দ ঋষি উপত্যকার মানুষের কাছে হজরত বাবা নুরউদ্দিন ঋষি (রেহমতুল্লা আল্লা) নামে অধিক পরিচিত। এই নন্দ ঋষিকে উপত্যকায় সুফিবাদের ঋষি-পরম্পরার প্রতিষ্ঠাতারূপে মান্যতা দেওয়া হয়। নন্দ ঋষির আধ্যাত্মিক বিকাশের পিছনে মা লাল দেদের (Lal Ded) অপরিসীম প্রভাব ছিল। মা লাল দেদ (1320CE-1392CE) উপত্যকায় লাল্লা, লালেশ্বরী প্রভৃতি নামে পরিচিতা ছিলেন। ইনি মীরাবাঈয়ের মতন সুর-সাধিকারূপে ইষ্টদেব ঈশাই (শিব)-এর আরাধনা করতেন। তাঁর গানগুলি রূপকধর্মী ও অন্তর্নিহিত অর্থের রহস্যে মোড়া। মা লাল দেদের গানের সংকলন 'লাল বাক' নামে পরিচিত। নন্দ ঋষি জন্মগ্রহণ করার পর নিজের মায়ের বদলে মা লাল দেদের স্তন্যপান করেছিলেন। এই নন্দ ঋষি প্রথমে চারার-ই-শরিফের বদলে আইশমোকামকে তাঁর সাধনাস্থলরূপে বেছে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর শিষ্য হজরত বাবা জৈনুদ্দিন ঋষি (রেহমতুল্লা আল্লা)-কে এই আইশমোকামে সাধনার নির্দেশ দিয়ে নিজে চারারই শরিফে চলে আসেন এবং সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। এখানে গুহার ভিতর তাঁর সাধনস্থলে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী আসেন তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে। যিশুর সঙ্গে যেহেতু সরাসরি যুক্ত নয় তাই বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। শুধু দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছি, প্রথমটি এখানকার 'Zool' বা 'Phrow' উৎসব যা আজও পালিত হয়। বছরে একদিন সূর্যাস্তের পর আগত ভক্তের দল গাছের ডালে আগুন জ্বেলে নির্দিষ্ট ছন্দে শরীর দুলিয়ে বাবা জৈনুদ্দিন ঋষির নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত সান্ধ্য-প্রার্থনার সময় উপস্থিত হয়। কৌতূহলের বিষয়, বাবা জৈনুদ্দিন ঋষির আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই এই প্রথা বা উৎসব এখানে প্রচলিত ছিল। প্রায় দু' হাজার বছরের পুরনো, অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের সমসাময়িক এই প্রথা। প্রশ্ন আসে, দু' হাজার বছর আগে কার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে এই উৎসব পালন হতো? তাছাড়া এই ধরনের প্রথা ইসলামসম্মত তো নয়ই, এমনকী সুফিদের মধ্যে অন্য কোথাও আমার অন্তত নজরে আসেনি। দ্বিতীয়ত, এই আইশমোকামে একটি ছড়ি বা লাঠি 'ম্যাজিক রড' নামে সংরক্ষিত আছে (বর্তমানে কাউকে দর্শন করতে দেওয়া হয় না)। প্রবাদ আছে যিশু প্যালেস্টাইন থেকে ভারতে আসার পথে এই ছড়ি বা লাঠিটি (ম্যাজিক রড) ব্যবহার করেছিলেন এবং তা আজও এখানে সংরক্ষিত থাকার কারণে আইশমোকাম দরগার অপর নাম 'ছড়ি ঘর' বা 'হাউস অফ রড'। জনশ্রুতি, যিশু কাশ্মীরে পদার্পণ করে প্রথমে কিছুদিন এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। (পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য পাহাড়ে চলে আসেন) তাই এই জায়গার নাম আইশমোকাম অর্থাৎ 'বিশ্রাম গৃহ'।

ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পুরাণকে গালগল্প ভেবে অনেকে উড়িয়ে দিতে চাইলেও পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না।

ভবিষ্যপুরাণ এমনই একটা গ্রন্থ যেখানে শুধু যিশুখ্রিস্টের বিষয়েই নয়, মুসা (মোজেস) ও মহম্মদদের বিষয়েও অনেক কিছু বলা আছে। ভবিষ্য পুরাণের তৃতীয় অধ্যায় (প্রতিসর্গ পর্ব)—এর বিংশ উপপর্বের নামে হচ্ছে, ''ভরতখণ্ডের অষ্টাদশ রাজ্য স্থান বর্ণন''। এই পর্বে মোট ৩৪টি শ্লোক আছে। এরমধ্যে ১৪ নম্বর শ্লোকের শেষভাগে বলা আছে, এইভাবে একশো বছর অতিক্রান্ত হলে শকাদিগণ রাজা হলেন। এরপর ২১ থেকে ৩৪ নম্বর শ্লোক অবধি যিশুর বিষয়ে বলা হয়েছে—একদা শকাধীশ হিমতুঙ্গ হুনদেশে পাহাড়ের মধ্যে শুভ্র পুরুষকে দেখলেন যিনি বলবান, গৌরাঙ্গ ও শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি কে?'' উত্তরে সেই পুরুষ বললেন, ''কুমারী গর্ভজাত আমাকে ঈশপুত্র বলে জানবে। আমি ম্লেচ্ছধর্মের বক্তা ও সত্য পরায়ণ।'' উত্তর শ্রবণ করে রাজা বললেন, ''আপনার ধর্ম কী?'' তিনি বললেন, ''সত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হলে ও ম্লেচ্ছদেশ মর্যাদাহীন হলে মসীহ আমি এসেছি। দস্যু ভয়কারী ঈশামসী প্রাদুর্ভূত হয়। তাকে আমি ম্লেচ্ছগণের থেকে প্রাপ্ত করেছি, পুনঃ আমি মসীহত্ব প্রাপ্ত করেছি। হে ভূপতি, আমি ম্লেচ্ছধর্ম স্থাপন করেছি তা শ্রবণ করে মানসিক ও দৈহিক ভাবে নির্মল হোন। অর্থাৎ নিগমোক্ত জপ করে নির্মল হন। মানবগণের ন্যায়, সত্য বচন ও মন একপ্রকারে তা পালন করা উচিত। সূর্যমণ্ডলাস্থিত ঈশের ধ্যান ও পূজন করা উচিত, কারণ তিনি সূর্যের ন্যায় অচল। চলভূত তত্ত্ব তিনি কর্ষণ করেন। হে ভূপাল, এই কৃত্য দ্বারা মসীহা লয় প্রাপ্ত হয়। ঈশমূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করে ঈশা মসীহা নামে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।'' একথা শ্রবণ করে সেই রাজা তাঁর পূজন করে ম্লেচ্ছস্থানে গমন করলেন। অতঃপর নিজ রাজ্যে ফিরে এসে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তারপর ৬০ বছর রাজত্ব করে স্বর্গে চলে যান।

ভবিষ্যপুরাণ থেকে যিশু ও তাঁর মতবাদের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেলেও কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন থেকেই যায়। 'হিমতুঙ্গ' উক্ত শকাধীশের নাম (বিশেষ্য) হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে উপাধিরূপে (বিশেষণ) ব্যবহৃত হয়েছে বলেই মনে হয়, হিমালয় সদৃশ উত্তুঙ্গ অর্থাৎ হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ পর্বতের সমতুল্য যাঁর খ্যাতি। কারণ 'হিমতুঙ্গ' নামে কোনও রাজার কথা ইতিহাসে বা লোককথায় অন্য কোথাও উল্লেখ নেই। প্রথমত, এই 'শকাধীশ' যেই হন না কেন তাঁর সঙ্গে যিশুখ্রিস্টের এটি প্রথম সাক্ষাৎকার ছিল। দ্বিতীয়ত, এই সাক্ষাৎকারের স্থান ছিল 'হুন দেশে'। তৃতীয়ত, এই 'শকাধীশ হিমতুঙ্গ' ৬০ বছর রাজত্ব করার পর মারা যান। চতুর্থত, সেই রাজা 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' করেছিলেন। এখন দেখতে হবে এই চারটি বিষয় কোন রাজার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথমত, 'শকাধীশ হিমতুঙ্গ'-কে একজন কুষাণরাজ হিসাবে মান্যতা দিলে ইতিহাস বিকৃত হয় না। প্রথম কদফেসিস, দ্বিতীয় কদফেসিস বা কণিষ্কের মধ্যে যে কেউ এই 'শকাধীশ' হতে পারেন, তবে প্রথম কদফেসিসের রাজত্বকাল ৫০ বছর ও দ্বিতীয় কদফেসিসের রাজত্বকাল ১০ বছর হওয়ায় এঁদের বাদ দিলেন অবশিষ্ট থাকেন কণিষ্ক। কিন্তু কণিষ্কের রাজত্বকালের মেয়াদ নিশ্চিতরূপে ৬০ বছরই ছিল তা বলা যায় না। অপরদিকে গোপাদিত্যের রাজত্বকাল নিশ্চিতরূপে ৬০ (রাজতরঙ্গিণী ও তারিখ-ই-হাসান এই দুটি গ্রন্থেও ৬০ বছর উল্লেখ রয়েছে) হলেও তাঁকে 'শকাধীশ' বলা যায় না, এছাড়া এটা তাঁদের মধ্যে প্রথম সাড়াৎকার হলে সময়কালটি অবশ্যই 54CE-এর আগে হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, 'হুন দেশ' বলতে যদি কাশ্মীরকে ধরে নিতে হয় তবে ইতিহাস বিকৃত করা হবে। কারণ কাশ্মীর হুনেদের অধিকারে এসেছিল কণিষ্ক, গোপাদিত্য ও যিশুখ্রিস্টের সয়কালের অনেক পরে সেই তোরমান, মিহিরকুলের আমলে। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীতে মিহিরকুলের উল্লেখ রয়েছে তোরমানের অনেক আগে। এছাড়া রাজতরঙ্গিণীতে অত্যাচারী রাজা মিহিরকুলের উত্তরসূরিরূপে গোপাদিত্যকে দেখানো হলেও প্রামাণ্য ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ওই সময় (49CE-109CE) আদৌ তাঁর রাজ্য কাশ্মীরকে 'হুন দেশ' বলা উচিত হবে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। তবে কণিষ্কের সময়ে কাশগড়, খোটান, ইয়ারকন্দ, খোরাসান ইত্যাদি অঞ্চল অবধি তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মূল রাজ্যের

বাইরে জয় করা এইসব অঞ্চলের কোনো এক স্থানের পাহাড়ে (লাদাকও হতে পারে) কণিষ্কের সাথে যিশুখ্রিস্টের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সাক্ষাৎকারের এই স্থানটি কাশ্মীরের বাইরে ছিল বলেই হয়তো পুরাণকার 'হুন দেশ' বলে তা বোঝাতে চেয়েছেন—হুণদের আদি বাসস্থানের কথা বলেননি। কিন্তু গোপাদিত্য কী কারণে কাশ্মীরের বাইরে 'হুন দেশ'-এ এলেন তা পরিষ্কার নয়। তবে পুরাণকার এটাও বলেছেন—একথা শ্রবণ করে সেই রাজা তাঁর পূজন করে ম্লেচ্ছস্থানে স্থারণ করলেন। অতঃপর নিজ রাজ্যে ফিরে এসে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এখানে 'নিজ রাজ্য' বলতে যদি কাশ্মীরকে বুঝিয়ে থাকেন তবে তা গোপাদিত্যকেই ইঙ্গিত করে, অন্যথায় কণিষ্ককে নির্দেশ করে। তৃতীয়ত, '৬০ বছর রাজত্ব করে স্বর্গে চলে যান' এই বাক্যটিও কিন্তু গোপাদিত্যকেই ইঙ্গিত করেছে। চতুর্থত, গোপাদিত্য অথবা কুষাণদের সময়কালে কোনো 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' হয়েছিল বলে শোনা যায় না। তবে অশ্বমেধ যজ্ঞ না হলেও কণিষ্কের আমলে এমন একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল যা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুরূপ সম্মানজনক। চতুর্থ তথা শেষ বৌদ্ধ-সংগীতি কণিষ্কের আমলে এই কাশ্মীরের কুণ্ডলবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (যদিও কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে পেশোয়ার (পুরুষপুর) বা জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল)। মনে হয় এই বৌদ্ধ-সংগীতিকেই রূপকার্থে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' বলা হয়েছে। শ্রীনগর শহর থেকে শালিমার বাগ মুঘল গার্ডেনে এসে পূর্বদিকে তিন কিলোমিটার এগোলে রাস্তার উপর হারওয়ান নামে একটি মনোরম স্থান আছে। এখানে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ। বিহারটি রাজতরঙ্গিণীর হুষ্ক, জুষ্ক, কণিষ্ক অংশে বর্ণিত নাগার্জুন নামক বিশিষ্ট বোধিসত্ত্বের বাসস্থান 'ষট্-অর্হৎ- বন'। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে কণিষ্কের সময় চতুর্থ তথা শেষ বৌদ্ধ-সংগীতি এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এই ধ্বংসাবশেষটি যে কুণ্ডলবন বিহারেরই তা এখনও অবধি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। জনশ্রুতি, যিশু এই বৌদ্ধ-বিহারটিতে মাঝে মধ্যেই আসতেন। প্রসঙ্গক্রমে জানয়ে রাখি, অনেকেরই ধারণা যিশু তাঁর জীবদ্দশায় বেশকিছু বছর লাদাকের হেমিস গুম্ফায় কাটিয়েছেন। কিন্তু হেমিসের ইতিহাস দেখলে তা বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। কারণ গুম্ফাটির প্রতিষ্ঠাই হয় আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে আর 1672CE-তে পুনর্নির্মাণ হয়েছিল লাদাখ-রাজ সেনঙ্গে নামগিয়ালের আমলে।

এত সব নথি, তথ্য, জনশ্রুতি হয়তো সবই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যেত যদি না তাঁর সমাধি মন্দিরটি কাশ্মীরের বুকে শোভা পেত। যদিও ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ইংরাজি স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া একটি প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছিল—করাচী শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এক মফস্সল অঞ্চলে সেন্ট টমাসের কবর রয়েছে। সেখানে এক শ্রেণীর নর-নারী নিজেদের সেন্ট টমাস দ্বারা দীক্ষিত খ্রিস্টান সম্প্রদায় বলে এখনো পরিচয় দেন। তাঁরা নাকি আবার ওই করবটিকে যিশুখ্রিস্টেরই কবর বলেন! প্রতি রবিবারে সন্ধ্যাবেলায় ওই কবরে ফুল ও ধূপধুনা দিয়ে বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান করেন। পূজার শেষে 'জয় যেশু কৃষ্টি' বলতে বলতে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে নৃত্যও করেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে, সেন্ট টমাস 72CE-তে ৩ জুলাই চেন্নাইয়ের সেন্ট টমাস পাহাড়ে অভিযুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং Mylapore (থিরুমালাই)-তে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যিশুখ্রিস্টের সমাধি-মন্দিরটি রয়েছে শ্রীনগর শহর থেকে উত্তর-পূর্বদিকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে খন্যিয়ার অঞ্চলের রোজাবল নামক এক সমাধি-মন্দিরে। সমাধি-মন্দিরের আঙিনায় মূল প্রবেশদ্বারের বাঁপাশে ইংরেজি ও উর্দু অক্ষরে লেখা দুটি সাইনবোর্ড প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম বোর্ডটিতে লেখা রয়েছে SHRINE OF HAZRAT YOUZA ASIF AND SYED NASEER-UD-DIN এবং দ্বিতীয়টিতে লেখা WHAT QURAAN & BIBLE SAYS ABOUT JESUS CHRIST, THE HOLY QURAAN SAYS :- THAT THEY (JEWS) SAID IN BOAST WE KILLED CHRIST JESUS THE SON OF MARY THE APOSTLE OF ALLAH BUT THEY KILLED HIM NOT NOR CRUCIFIED HIM BUT SO IT WAS MADE TO APPEAR TO THEM & THOSE WHO DIFFER THERE IN ARE FULL OF DOUBTS WITH NO (CERTAIN) KNOWLEDGE BUT ONLY CONJECTURE TO FOLLOW FOR OF A SURETY THEY KILLED HIM NOT NAY ALLAH RAISED HIM UP UN TO HIMSELF & ALLAH IS EXALTED IN POWER WISE (ALNISA 157-158 AL QURAAIN) উর্দুতে ওই ব্যক্তব্য তিন লাইনে লেখার পর পুনরায় লেখা আছে (BIBLE SAYS) SO THEN AFTER THE LORD (JESUS) HAD SPOKEN THEM HE WAS RECENED UP IN TO THE HEAVEN & SAT DOWN AT THE RIGHT HAND OF GOD. এইরকম একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বক্তব্যের দুটি সাইনবোর্ডের পাশাপাশি অবস্থান সত্যিই বিস্ময়কর।

প্রথম সাইনবোর্ডের বক্তব্য হচ্ছে, এই রোজাবল হজরত ইউজা আসিফ এবং সৈয়দ নাসিরুদ্দিনের সমাধি-মন্দির। কিন্তু দ্বিতীয় সাইনবোর্ডের বক্তব্য শুধুমাত্র যিশুর স্বর্গারোহণ নিয়ে। ইউজা আসিফ বা সৈয়দ নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে একটি শব্দও না লিখে যেন অসতর্কভাবে বলে ফেলা হচ্ছে—সমাধি-মন্দিরে কে শুয়ে? যিশু তো স্বর্গে আছেন! ভেবে দেখার বিষয়, যদি ইউজ অসিফ বা সৈয়দ নারিরুদ্দিনের সঙ্গে যিশুর কোনোরকম সম্পর্ক না থাকে তবে দ্বিতীয় সাইনবোর্ডটির প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? তাছাড়া শুধু কাশ্মীর বা ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে আর কোনো দ্বিতীয় সমাধি-মন্দির (Shrine) আছে কি যেখানে যিশুকে নিয়ে লেখা এইরকম আরও একটি সাইনবোর্ড রয়েছে? উপরন্তু দ্বিতীয় সাইনবোর্ড থেকে পরোক্ষভাবে কি এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে না, যিশুর সঙ্গে ইউজ অসফ বা সৈয়দ নারিরুদ্দিনের মধ্যে কোনও না কোনও সম্পর্ক আছেই। সম্পর্ক তো

সত্যিই আছে, তবে সৈয়দ নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে নয় তা কেবলমাত্র ইউজ আসফের সঙ্গে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী ইউজ আসফের সমাধিটি পূর্ব-পশ্চিমদিক বরাবর, কিন্তু সৈয়দ নাসিরুদ্দিনের সমাধিটি উত্তর-দক্ষিণদিক বরাবর রয়েছে। অর্থাৎ সমাধি দেওয়ার প্রথানুযায়ী সৈয়দ নাসিরুদ্দিনের মজহব যদি ইসলাম হয় তবে ইউজা আসিফের পরিচয় অবশ্যই অ-ইসলামীয় এবং নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ইহুদি-ধর্মানুসারী। এছাড়া সমাধিকক্ষের ভিতর বেদীর উপর ইউজ আসফের পদযুগলের যে পাথরের প্রতিকৃতিটি রয়েছে তাতে ক্রুশবিদ্ধের চিহ্ন স্পষ্ট।

বিভিন্ন সময়কালের নানা গুণীজনের লেখায় রোজাবল-কে ইউজ আসফ ওরফে ইউজা ওরফে যিশুখ্রিস্টের সমাধি মন্দিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে তার সবগুলির উল্লেখ করতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গের বই হয়ে যাবে। এরমধ্যে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে মুফতি ডিক্রি নামে খ্যাত এক ঐতিহাসিক দলিল। 1194AH (হিজরি সন), অর্থাৎ 1780CE-তে এই ফতোয়াটি জারি করা হয়েছিল। প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী এই সময়ে কাশ্মীরের শাসক ছিলেন আফগানের দুরানী রাজবংশীয় সম্রাটগণ। 'মুফতি', অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম-বিষয়ক অভিজ্ঞ এবং যিনি ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা ও ইসলামের অলোকে বিভিন্ন ফতোয়া (Decree) প্রদান করেন। কোনো একজন ব্যক্তি 'মুফতি' হতে চাইলে প্রধানত কয়েকটি ধাপে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় এবং এই যোগ্যতা ইসলামি মৌলভি দ্বারা নিশ্চিতকৃত হতে হয়। তাঁকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিশেষভাবে পারদর্শী হতে হয় ও প্রমাণ করতে হয় যে তিনি ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য। বিষয়গুলি হচ্ছে ঃ (১) আরবি ভাষায় অভিজ্ঞতা, (২) কোরান ও হাদিসে শাস্ত্রে পারদর্শিতা, (৩) উসুল আল ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শিতা এবং (৪) সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা। সেই সালে মুফতির বিচারালয়ে রেহমন খান, পিতা—আমির খান, নামক এক ব্যক্তি একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটির আর্জি ছিল, নবি ইউজ-আসফের পবিত্র দরগার ভক্তদের উৎসর্গীকৃত টাকা পয়সা ও দান-সামগ্রীর একমাত্র হকদার হিসাবে নিজের (অর্থাৎ রেহমান কান নামধারী ব্যক্তিটির) দাবিকে প্রতিষ্ঠা করে একটি নিষেধাজ্ঞা বলবত করার, যে সকল ব্যক্তিরা তার অধিকারে বাধা দিচ্ছে তাদের বিরত হতে বাধ্য করা। মামলাটির রায়ে বলা হয়েছিল—প্রমাণাদি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো : ইহার (ইউজ-আসফের দরগার) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রাজা গোপাদিত্যের রাজত্বকালে, যিনি অনেক মন্দির তৈরি ও সংস্কার করেছিলেন, বিশেষত সলোমন পাহাড়ে সলোমনের সিংহাসনের, যখন ইউজ-আসফ উপত্যকায় এসেছিলেন। এরপর রায়ের অনেকটা অংশ জুড়ে ইউজ-আসফের গুণকীর্তন করে শেষের দিকে বলা হয়েছে, তিনি মৃত্যুর আগে অবদি ঘোষণা করে গেছেন, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম এক নবি, তাঁকে রোজাবলে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। 871AH (হিজরি সন), অর্থাৎ 1467CE-তে ইমাম মুসা-রাজা (Imam Musa-Raza)-এর বংশধর সৈয়দ নাসিরুদ্দিন-কে ইউজ-আসফের পাশে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ভক্তরা এই সমাধি-মন্দির দর্শন করতে আসেন এবং তখন থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে রেহমন খান এই সমাধি-মন্দিরের সেবাইত। তাই বিচারালয় এই ফতোয়া জারি করেছে, সমাধি-মন্দিরে ভক্তদের উৎসর্গীকৃত যাবতীয় টাকা-পয়সা ও দান-সামগ্রীর একমাত্র হকদার রেহমান খান, যেমনটি তিনি আগে থেকেই ছিলেন এবং অন্য কেউ এর হকদার হতে পারবেন না। এই ফতোয়ানামায় মুল্লা ফাজিলসহ মোট আটজন তারিখ ও সিলমোহর দিয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। ফতোয়াটি আজ অবদি বৈধ, কারণ এখনও পর্যন্ত কোনও মুফতি এটিকে খারিজ করেননি।

মামলাটির রায়ের মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে। বিচারালয় ফতোয়া জারির সময় স্পষ্টত স্বীকার করে নিয়েছেন যে রোজাবলে সমাধিস্থ ইউজ আসফ এবং সলোমন পাহাড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ইউজ আসফ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। সুতরাং গোপাদ্রিতে (শঙ্করাচার্য পাহাড়ে) জ্যেষ্ঠেশ্বর মন্দিরের সিঁড়ির গায়ে সুলেমনের স্থাপন করা ফলক নকল নয় এবং ফলকের বক্তব্যও সঠিক। অর্থাৎ 'তিনি (ইউজ আসফ) ছিলেন যিশু, ইজরায়েলের সন্তানদের অবতার' —এই উদ্ধৃতিযুক্ত ফলকটিকেও বিচারালয় লিখিতরূপে তারিখ ও সিলমোহর-সহ মান্যতা দিচ্ছেন। ফলত রোজাবলের যিশু সম্পর্কিত দ্বিতীয় সাইনবোর্ডটির প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা আদৌ থাকছে কি? প্রকৃতপক্ষে বাস্তবসম্মত সত্যকে চাপা দিয়ে না রাখতে পারলে কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগে যে! আজ যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যিশুখ্রিস্টের আদর্শ ও বাণী একান্ত ভাবেই ভারতীয়, বিশেষত সনাতন ভাবধারা ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা থেকেই অনুপ্রাণিত, তাহলে খ্রিস্টীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বে আর সেইসঙ্গে এদের পদলেহনকারী ভারতের কিছু মানুষ ও সংগঠনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। তাই হয়তো আমাদের চিরদিন বিশ্বাস করে যেতে বাধ্য করা হবে যিশু ভূস্বর্গের মাটিতে নয়, স্বর্গের আসমানে বিরাজমান। (শেষ)

তথ্যঋণ ঃ

১. মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিতম্ ভবিষ্যপুরাণম্—শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি) : নবভারত পাবলিশার্স।

২. ঐতিহাসিক কলহন বিরচিত রাজতরঙ্গিণী—শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় : জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং।

৩. RAJATARANGGINI OF KAHLANA PANDITA–JOGESH CHUNDER DUTT : TRUBNER & CO. LONDON

৪. THE CRUCIFIXION BY AN EYE-WITNESS : CHICAGO INDO-AMERICAN BOOK CO.

৫. কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা।

৬. যিশুখ্রিষ্টের জীবনের এক অজ্ঞাত অধ্যায়—অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাচী পাব্লিকেশনস্।

ঔরঙ্গাবাদে বহু খ্রিস্টান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিপান্ন জন খ্রিস্টান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পৈঠানের বেদানুসারী সংগঠন ব্রাহ্মণ সভার উদ্যোগে, স্থানীয় নাথ মন্দিরে। ব্রাহ্মণ সভার প্রধান সুযশ কমলাকর শিবপুরী বলেন, 'জালনা জেলার সান্থা অঞ্চলের ১২টি পরিবারের মোট ৫৩ জন পুরুষ ও মহিলা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন।' তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একজন খ্রিস্টান কি হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে পারেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'ওরা অনেকদিন ধরে ধর্ম পরিবর্তন করতে চাইছিলেন। ওদের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে ব্রাহ্মণ সভা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়। যাতে ওরা সর্বসমক্ষে স্বেচ্ছায় ধর্ম পরিবর্তন করতে পারেন তার জন্য নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগামী ৫ জানুয়ারি আরও ২২টি পরিবারের ৬৫ জন

খ্রিস্টান সদস্য হিন্দু ধর্মে ফিরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। ওইদিনও ব্রাহ্মণ সভার উদ্যোগে পৈঠানের নাথ মন্দিরে ধর্মীয় আচারবিধি পালনের মাধ্যমে তাদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

করোনা-বিধি শিকেয়

বড়দিনে পার্কস্ট্রিটে বিপুল জনসমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কলকাতার নাগরিক সমাজের একাংশ কি দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছেন? প্রশ্নটি তুলেছেন কলকাতারই কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক। বড়দিনের সন্ধ্যায় পার্কস্ট্রিটে বিপুল জনসমাগম তাঁদের মতো অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। একদিকে সারা দেশ যখন করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়ান্ট ওমিক্রনকে আটকাতে যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় লড়াই করছে সেখানে বড়দিন নিয়ে কলকাতার এই কাণ্ডালপনা সত্যিই উদ্বেগজনক। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকার বড়দিনের কথা মাথায় রেখে নাইট কারফিউ প্রত্যাহার করায় সন্ধ্যের পর থেকেই পার্কস্ট্রিটে ভিড় বাড়তে থকে। পুলিশ থাকলেও তারা এই ভিড় সামাল দিতে পারেনি। ফলে জনতা এক সময়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এমনও দেখা গেছে রেস্তোরাঁয় জায়গা পাওয়া নিয়ে ঝগড়া হাতাহাতিতে পরিণত হয়েছে। ওমিক্রন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কার মধ্যে বড়দিনের সন্ধ্যে থেকেই পার্কস্ট্রিটের ভিড় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনদের মধ্যে অধিকাংশই এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন। বড়দিনে শুধু পার্ক স্ট্রিটেই নয়, ভিড় হয়েছিল সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল, আলিপুর চিড়িয়াখানা, ইকোপার্ক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও নিকো পার্কেও। বেশিরভাগ দর্শকের মুখেই মাস্ক ছিল না। আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল মানুষকে ওমিক্রনের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেন।

ইউনিসেফের ফোটো অব দি ইয়ার

বিজয়ী বাঙ্গলার সুপ্রতিম, সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইউনিসেফ' ফোটো অব দি ইয়ার ২০২১'-এ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে দুই বাঙ্গালি। প্রথম স্থানে আছেন পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রতিম ভট্টচার্য। দ্বিতীয় স্থানে সৌরভ দাস।

মূলত বিশ্বময় যে শিশুরা কঠিন লড়াইয়ের যোদ্ধা তারাই এই ফোটোগ্রাফিক প্রতিযোগিতার মূল বিষয়বস্তু। তবে এটাকে স্রেফ প্রতিযোগিতা ভাবলে একটু ভুল হবে। ফোটোগ্রাফাররা তাদের ক্যামেরায় বন্দি করেন কোনো নাম না জানা স্থানের দুর্দশার কাহিনি। সেখানে শিশুদের দুর্দশার কথা নজরে আসে ইউনিসেফ তথা গোটা বিশ্বের। তাই ফোটো জার্নালিজম, ফোটোগ্রাফি ও সমাজসেবা, তিনটি দিক থেকেই এই প্রতিযোগিতা তাৎপর্যপূর্ণ।

এ বছরের প্রথম পুরস্কার প্রাপক সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ছবির প্রেক্ষাপট সুন্দরবন। সেখানেই বিগত দু' দশক ধরে কাজ করছেন তিনি। পরিবেশ আন্দোলন ও মানবাধিকার নিয়ে তাঁর কাজ। সুন্দরবনের নামখানার শিশুদের জীবন সংগ্রাম ফুটে উঠেছে তাঁর ফোটোগ্রাফিতে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সুন্দরবনের একটি মেয়ে। সেই ছবিই লেন্সবন্দি করেছিলেন বারুইপুরের বাসিন্দা সুপ্রতিম। ছবিটিতে মেয়েটির মুখের যে অভিব্যক্তি তাতে বন্যার জল, ঘূর্ণিঝড় যেন তার মনের ঝড়কেই তুলে ধরেছে। চাহনিতে স্পষ্ট রাগ, আবার যেন কোথায় এসে হতাশায় ভরা সেই দৃষ্টি। বন্যায় ভেসে গিয়েছে সর্বস্ব। সুপ্রতিম জানিয়েছেন, বছর এগারোর মেয়েটির নাম পল্লবী পাড়ুয়া। ঝড়ে ওদের নামখানার বাড়ি ভেসে গিয়েছে। ওর মুখে রাগ স্পষ্ট। সেই তীব্র স্পষ্ট অভিব্যক্তিই আমাকে তার ছবি তুলতে আগ্রহী করেছে।

সুপ্রতিমের ফোটো সিরিজে উঠে এসেছে এমনই সুন্দরবনের এমনই বহু ছবি। তাঁর সিরিজটির নাম 'ডুবন্ত স্বপ্ন'।

বিশেষ আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় ৭৪ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। স্বস্তিকা নিরপেক্ষ নয়, রাষ্ট্রীয়তার পক্ষে। রাষ্ট্রবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকার পাতায় আপনি তা পাবেন।

বাজার চলতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে না, অন্যান্য লেখার ভিড়ে আসল তথ্যটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকার লেখায় তখন আপনি মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। এক কথায়, স্বস্তিকা জাগ্রত হিন্দু চেতনার তথা ভারতাত্মার কণ্ঠস্বর।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক হাল-হকিকত এবং প্রকৃত চিত্রটি জানতে হলে স্বস্তিকা পড়তে হবে। স্বস্তিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ভারতের পরম্পরা ও আধুনিকতার এ এক অসাধারণ মেলবন্ধন। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো পত্রিকা।

এবছর স্বস্তিকা ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, মঙ্গলবার এই গ্রাহক অভিযানের সূচনা। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক হোন— এটাই আমাদের অনুরোধ। পূজাসংখ্যা-সহ এক বছরে প্রকাশিত স্বস্তিকার সব সংখ্যাই আপনি বার্ষিক গ্রাহক হিসাবে পাবেন। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা-৭৫' বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বস্তিকা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকার শ্রীবর্ধনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের রেট

প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (কালো/সাদা) ১৫০ টাকা

প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (রঙিন) ২২৫ টাকা

যোগাযোগ : জয়রাম মণ্ডল :
৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন পাঠানোর শেষ তারিখ :
১০ জানুয়ারি, ২০২২

সাধু-গুরু সেবা আশ্রম ও হরি ভূমি আশ্রম
পরিচালনায়- সকল ভক্তবৃন্দ

দাতার নাম.....মোবাইল নং.....
ঠিকানা.....
দান.....টাকা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল

শ্রী শ্রী জয়দেব মেলা

Hari Bhumi Ashram 9832975447

সাধু-গুরু সেবা আশ্রম ও হরি ভূমি সেবা প্রতিষ্ঠান চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (হরি ভূমি আশ্রম)
Govt Reg. No.- 03872, Niti Aayog Unique ID- WB/2019/0246013

পরিচালনায়- সকল ভক্তবৃন্দ

মাননীয় মহাশয় / মহাশয়া,
শুভ মকরসংক্রান্তির পুর্ণমিলন উপলক্ষে শ্রী শ্রী জয়দেব ধামে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই, ও জানাই আন্তরিক, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যিক অভিনন্দন ।
আগামী ২৮ শে পৌষ ১৪২৮ সন (ইং 13ই জানুয়ারী 2022) বৃহস্পতিবার থেকে ২রা মাঘ ১৪২৮ সন (ইং 16ই জানুয়ারী 2022) রবিবার পর্যন্ত বাউল গান, ধর্মীয় আলোচনা সভা, সাধু- সন্তদের কল্পতরু বিতরণ ও আখড়াই সেবা চলিবে । আপনাদের সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য- যে সমস্ত ছোট ছোট আশ্রম আছে, সেই আশ্রমগুলোকে বৈদিক গুরুকুল ও গো-শালা নির্মানের জন্যে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

মহাশয় / মহাশয়া.....নির্বন্ধ হইতে সাহায্য বাবদ.....টাকা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল।

Name of Account-
Hari Bhumi Seba Pratishthan Charitable Trust
Bank Name- HDFC Bank
Branch Name- Rampurhat
A/c- 50200059066414
IFCS Code- HDFC0002506
Phone Pay, Google Pay- 9641843307

ভিক্ষা আমাদের একমাত্র সম্বল

অঞ্জলী মাতা জী
সম্পাদিকা
সাধু-গুরু সেবা আশ্রম

শ্রী প্রদীপ দাস
সভাপতি
হরি ভূমি আশ্রম

বিনীত-
সকল ভক্তবৃন্দ
শ্রী কানাই মহারাজ জী
সভাপতি
সাধু-গুরু সেবা আশ্রম

YouTube - Hari Bhumi Ashram- শ্রী শ্রী জয়দেব মেলা ২০২২ শ্রী শ্রী জাঁয়দেব মেলা
আরো জানতে নিম্নলিখিত নাম্বারে ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন- 7679823926 / 9832975447 / 7384454891
Email : haribhumiashram@gmail.com, Website- www.haribhumigo.org
Hari Bhumi Ashram নামে যে সকল সোশ্যাল মিডিয়ার প্লাটফর্ম আছে সেগুলো ফলো, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন।

Hari Bhumi Ashram

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১৯।।

এইভাবে গুরুজী স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মন জয় করলেন।

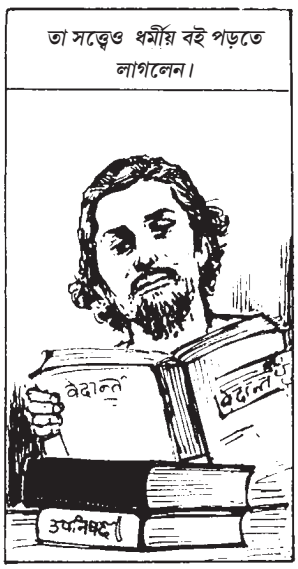

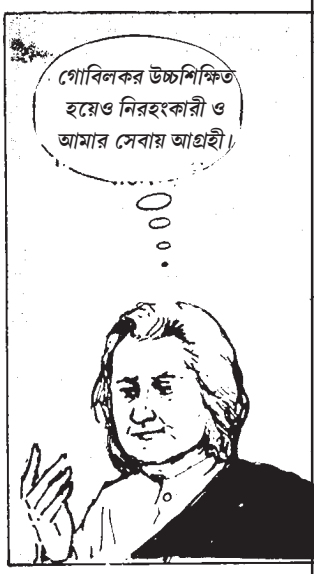

মাধবরাও এরপর কখনো বাবা-মাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করেননি।

চলবে